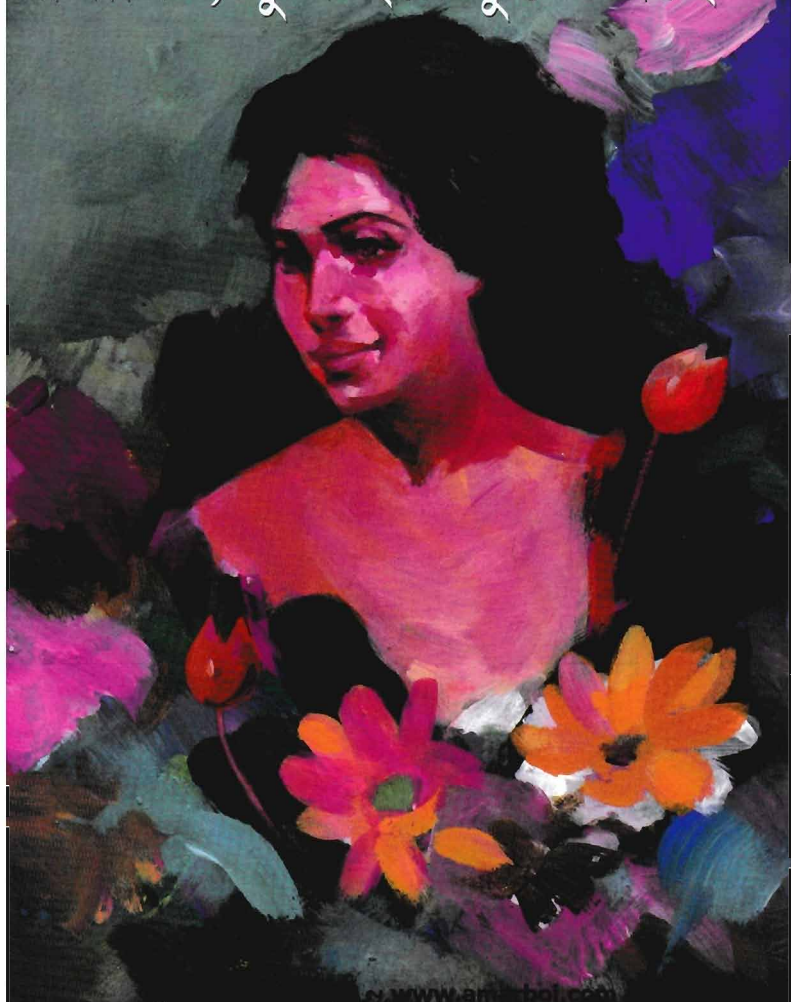


সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
মার্গারিট, ফুল হয়ে ফুটে আছে



বহু-বহুকাল আগে আয়ওয়া শহরে গেছিলেন
সুনীল। সেখানে দেখা মার্গারিটের সঙ্গে।
অপূর্ব সুন্দর, সুগন্ধী ফুলের মতো মিষ্টি মেয়ে।
সুনীল-মার্গারিট প্রেম কাহিনি বিধৃত আছে
সুনীলের একাধিক উপন্যাসে।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হল মার্গারিটের? তাকে
আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেন?...
সুনীল-মার্গারিট রোম্যান্টিক কাহিনির শেষ
অধ্যায় এই উপন্যাস।



বহু-বহুকাল আগে আয়ওয়া শহরে
গেছিলেন সুনীল। সেখানে দেখা মার্গারিটের
সঙ্গে। অপূর্ব সুন্দর, সুগন্ধী ফুলের মতো
মিষ্টি মেয়ে, যে কবিতার জগতেই সর্বক্ষণ
বাস করে।

সুনীল-মার্গারিট প্রেম কাহিনি বিধৃত আছে
অনবদ্য কাহিনি ‘সুদূর ঝরনার জলে’ বা
‘ছবির দেশে কবিতার দেশে’ (ভ্রমণ সমগ্র
বইয়ের কাহিনিমালায়)। কিন্তু কী হল
মার্গারিটের? তাকে আর খুঁজে পাওয়া
যাচ্ছে না কেন?...

সুনীল-মার্গারিট রোম্যান্টিক কাহিনির
শেষ সিক্যুয়েল ‘মার্গারিট, ফুল হয়ে ফুটে

আছে’।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



জন্ম ২১ ভাদ্র ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪), ফরিদপুর, বাংলাদেশ। শিক্ষা কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা।

প্রথম রচনা শুরু কবিতা দিয়ে। ‘কৃষ্ণিবাস’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। কবি হিসেবে যখন খ্যাতির শীর্ষে, তখন উপন্যাস রচনা শুরু করেন। প্রথম উপন্যাস ‘আত্মপ্রকাশ’। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘একা এবং কয়েকজন’।

ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দু-বার। ১৯৮৩-তে পান বঙ্কিম পুরস্কার। ১৯৮৫-তে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার। এরপর ছোটদের সাহিত্যে পেয়েছেন ‘বিদ্যাসাগর পুরস্কার’।

বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

নবযুগ প্রকাশিত বই মার্গারিট, ফুল হয়ে ফুটে আছে, পাহাড় ঘেরা হৃদের ধারে (উপন্যাস)।

ମାର୍ଗାରିଟ ଫୁଲ ହସେ ଫୁଟେ ଆছে

মার্গারিট

ফুল হয়ে ফুটে আছে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



নবযুগ প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

©
প্রস্তুতকার

প্রকাশকাল : অগ্রহায়ণ ১৪১৮, ডিসেম্বর ২০১১

মূল্য : ১৭০.০০ টাকা

প্রকাশক অশোক রায় নন্দী, নবযুগ প্রকাশনী, ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ। মোবাইল ০১৭১১-৫২১৯৯৮, ০১৯৪০-১১২৬৭২
মুদ্রক : আবির কম্পিউটার, ০১৭১০-৫৪৬৩০১, মুদ্রণ : নিউ এস. আর প্রিন্টার্স
লন্ডনে প্রাপ্তিস্থান: সঙ্গীতা, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, ফোন : ০০৪৪২০৭২৪৭৫৯৫৪
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুজিত চক্রবর্তী

MARGARIT PHOOL HOYE PHUTE ACHHE By Sunil Gangopadhyay.
Published By Ashok Roy Nandi of Nabajuga Prokashani
67 Paridas Road, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
Date of Publication December 2011. Price Tk. 170.00.
ISBN-978-984-8858-38-7

‘মার্গারিট ফুল হয়ে ফুটে আছে’ সু-সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও ভারতের প্রকাশক
পত্রভারতীর যুগ্ম সম্মতিক্রমে প্রকাশিত। এই বইয়ের কোনও অংশ নবযুগ প্রকাশনীর
অনুমতি ব্যতিরেকে বাণ্যাদেশে প্রকাশ করা সম্পূর্ণ বে-আইনি এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।
দুর্ভাগ্যবশত প্রকাশক একই বছর www.amarbol.com এ

কিছু কথা

সেই প্রথমবার ১৯৬৩ সালে আমেরিকার আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জলপানি পেয়ে আমি সাগর পাড়ি দিয়েছিলাম। তখন আমার বয়েস তিরিশের কম, বিয়ে-টিয়ের চিন্তা করি না, সমসাময়িক কচি বন্ধুদের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর উদ্দাম জীবন কাটিয়েছি। সে সময় আমি শুধু কবিতাই লিখি, কৃত্তিবাস নামে কবিতা পত্রিকার সম্পাদক, জীবনে কখনো রাশি রাশি গদ্য ও বড় বড় অধ্যায়ের উপন্যাস রচনার কথা আমার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। (বরং একটি কবিতায় আমি ঐ ধরনের গদ্য লেখকদের বিদ্রূপও করেছি)।

আয়ওয়া শহরে আমার নির্জন বাস কালে আমি কবিতা নিয়েই মেতে ছিলাম। সেই সময় আমার লেখা কবিতাগুলি “আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি” কাব্য গ্রন্থে ধৃত আছে। এরই মধ্যে মার্গারিট ম্যাতিউ নান্নী ফরাসি যুবতীটির সঙ্গে আমার গভীর সখ্য হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শহরটিতে তরুণ-তরুণীদেরই সংখ্যাধিক্য। আরও অনেকের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব হতে পারত। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সেখানে আর কোনো পুরুষ বা নারীর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা হয়নি, আর কারুর সম্পর্কে আমার স্পষ্ট স্মৃতিও নেই। ঐ তরুণীটিই যেন আমায় সর্বক্ষণ ঘিরে রেখেছিল।

মার্গারিট কবি ছিল না, কিন্তু কবিতার প্রতি ছিল অদ্ভুত টান। বলা যায়, পাগলের মতন ভালোবাসা। আমার সারা জীবনে তার গভীর প্রভাব রয়ে গেছে। সে আমাকে ওখানে বিভিন্ন পার্টিতে গিয়ে হুল্লোড় করা কিংবা বেশি মদ্যপান ইত্যাদি থেকে নিবৃত্ত করেছিল, যেটা ওখনকার জীবনে ছিল স্বাভাবিক। তার বদলে আমরা ঘরের মধ্যে মুখোমুখি বসে কবিতা পাঠ

করতাম। ফরাসি সাহিত্য সম্পর্কে আমার তেমন কিছু জ্ঞান ছিল না। যদিও বিদেশে যাবার আগে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আলিয়াস ফ্রাঁসেজে ফরাসি শেখার ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম, কিন্তু মনোযোগ দিতে পারি নি। এমনকী কমলকুমার মজুমদার আমাদের কয়েকজনকে ধরে বেঁধে গরমকালের দুপুরে ফরাসি শেখাবার জন্য বসাতেন। কিন্তু কমলকুমারের পদ্ধতি ছিল অতি কঠোর। সংস্কৃত শব্দরূপ, ধাতুরূপ মুখস্থ করাবার মতন তিনিও *etre* আর *avoir*-এর রূপ মুখস্থ করাতেন। সে পদ্ধতি এমনই নীরস যে আমরা এক এক করে কমলকুমারের ক্লাস থেকে সরে পড়তে লাগলাম। ফরাসি ভাষা শেখা হয়নি, আর পেঙ্গুইনের ইংরিজি অনুবাদে ফরাসি কবিতার সংকলন পড়া পর্যন্ত শুধু ফরাসি সাহিত্য সম্পর্কে বিদ্যে।

মার্গারিটের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার আধুনিক ফরাসি সাহিত্য সম্পর্কে অনেক ধারণা হয়ে যায়। তার প্রিয় কবি গিয়ম অ্যাপোলিনিয়ের-এর বহু কবিতা সে আমাকে পড়িয়ে শোনায়ে। আমিও তাকে কালিদাসের শকুন্তলা সম্পর্কে বেশ কিছুটা জ্ঞান দিয়ে দিই। এইরকম আদান-প্রদান চলতে থাকে। মজার ব্যাপার এই, আমেরিকায় বসে ওখানকার সাহিত্য সম্পর্কে বেশি সময় না দিয়ে আমি ফরাসি সাহিত্য সম্পর্কে পাঠ নিই। কয়েকটি ফরাসি গানও শোনা হয়ে যায়।

সেবারে আমেরিকায় আমার বসবাস এক বছরেরও কিছু বেশি। আরও অনেকদিন থেকে যাওয়ার সুযোগ ছিল। অন্যান্য দেশ থেকে অন্যান্য ভাষার যে কয়েকজন কবি এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আর দেশে ফিরলেন না। কিন্তু দেশের জন্য, বন্ধুদের জন্য, বাংলা ভাষার জন্য আমার খুব মন কেমন করতে লাগলো। এদিকে মার্গারিটকে ছেড়ে যেতেও মন চায় না। মার্গারিট শিগগিরই কলকাতার ফরাসি দূতাবাসে চাকরি নিয়ে চলে আসবে, এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে আমি ফেরার বিমানে চাপলাম।

মার্গারিটের কলকাতায় আসা বিলম্বিত হতে লাগল। কিন্তু চিঠি লিখত অনবরত। এমনকি একদিনে তার দুটো-তিনটে চিঠিও পেয়েছি। এর মধ্যে স্বাভাবিক সঙ্গ আমার পরিচয় হয়। স্বাভাবিক কথা জানালাম মার্গারিটকে। স্বাভাবিক

কিছুদিন ফরাসি শিখেছিল, দু'জনে চিঠি লেখালেখি শুরু করল তারপর আমাদের বিবাহ এবং এক বছরের মধ্যেই সন্তানের জন্ম। সে খবর পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে মার্গারিট আশীর্বাদ স্বরূপ একটা খামের মধ্যে কয়েকটা ডলার ভরে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং সে নিজেকে আমার ছেলের গড মাদার হিসেবে ঘোষণা করল।

তারও পরে কয়েক মাস ধরে রইলো চিঠিপত্রে যোগাযোগ, হঠাৎ এক সময় একেবারে চূপ। এত চিঠি লিখতে ভালোবাসে সে অথচ আর একটাও চিঠি লেখে না, আমার চিঠির কোনও উত্তরও দেয় না। আমার পরে যাঁরা আয়ওয়া গিয়েছিলেন, শঙ্খ ঘোষ এবং জ্যোতির্ময় দত্ত, এঁদের সঙ্গেও মার্গারিটের পরিচয় হয়েছিল, এঁরাও আর কোনও সন্ধান জানেন না। মার্গারিট আয়ওয়া শহরেই আর নেই, এ খবরও পেয়েছিলাম। সে কোথায় গেল? তারপর থেকে সে একেবারে অদৃশ্য।

সতেরো বছর পর আমি আবার আয়ওয়া শহরে গিয়েছিলাম, ছিলাম পাঁচ মাস। এবারে সজীক। এইবার সেখানে, পুরোনো পরিচিতদের সূত্র ধরে বহু অনুসন্ধান করেছি মার্গারিটের। এই উপন্যাসে রয়েছে সেই অনুসন্ধানেরই কাহিনি। এর আগে 'সুদূর ঝর্নার জলে' নামে নীললোহিতের উপন্যাসে মার্গারিটের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্কের কথা বিস্তারিতভাবে লিখেছি। 'ছবির দেশে, কবিতার দেশে' গ্রন্থেও অনেকখানি রয়েছে তার স্মৃতিকথা। মার্গারিটকে নিয়ে এই আমার তৃতীয় বই। আর কিছু লেখার রইল না।

এই বই মার্গারিটের স্মৃতির প্রতি আমার শেষ অর্ঘ্য।

১৪ নভেম্বর ২০১১
কোলকাতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



দ্বিতীয়বার আয়ওয়া শহরে পৌছোবার আগে থেকেই আমার মনের মধ্যে একটা নাম গুঞ্জরিত হচ্ছে, মার্গারিট, মার্গারিট।

প্রথমবারের তুলনায় দ্বিতীয়বারের এই আসার মধ্যে কত তফাৎ!

প্রথমবার আমার বয়েস সবেমাত্র আঠাশ পেরিয়েছে, নিতান্তই এক তরুণ কবি, এক বন্ধুর দাক্ষিণ্যে একটিমাত্র কবিতার বই বেরিয়েছে। আমারই বয়েসি কিছু তরুণ কবিদের পরিমণ্ডলের বাইরে ক'জনই বা আমায় চেনে। নেহাত পল এস্জেলের সুনজরে কি করে যেন পড়ে গিয়েছিলাম। আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের প্রধান এবং ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামের পরিচালক পল এস্জেল তখন সারা ভারতের বড় বড় শহরগুলোতে ঘুরে ঘুরে নানান ভাষার কবি, গদ্যলেখকদের সঙ্গে মেলামেশা করছিলেন। কলকাতাতেও ছিলেন বেশ কয়েকদিন। তারপর হঠাৎ এতজনের মধ্যে থেকে শুধু আমাকেই প্রথম বছরের জন্য তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই প্রোগ্রামে যোগ দেবার জন্য কেন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তা ব্যাখ্যা করা দুষ্কর।

আমার ওই নির্বাচনে অনেকেই খুব অবাক হয়েছিলেন। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিলাম আমি।

আমার তখন চালচুলো বলতে কিছু নেই। গরিব, রিফিউজি পরিবারের সন্তান, অতি কষ্টে কেঁদে-কঁকিয়ে এম এ পাশ করার পর কোনওমতে সামান্য একটা কেরানিগিরি জোগাড় করেছিলাম। এছাড়া দুবেলা টিউশনি, তারই কিছু টাকা বাঁচিয়ে 'কৃতিবাস' পত্রিকা প্রকাশ করা! বাল্যকাল থেকে ভ্রমণের নেশা। কিন্তু উপায় তো নেই। আমার অবস্থা তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কবিতার মতো!

ইচ্ছা সম্যক জগৎ দর্শনে,
কিন্তু পাথেয় নাস্তি
মন উড়ু উড়ু, দু'পায়ে শিকলি।
এ কী এ দৈবের শাস্তি!

অবশ্য দ্বিজেন্দ্রনাথ জমিদারের সন্তান। ইচ্ছে করলেই তিনি অন্তত তিনবার জগৎ-দর্শন করতে পারতেন। ওই কবিতা নিতান্তই কৌতুকের ছলে লেখা। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তব। কখনও দশ কুড়ি টাকা পেলেও মুর্শিদাবাদ কিংবা সাঁওতাল পরগনা চলে গেছি। পয়সা ফুরিয়ে গেলে মাঠের মধ্যে গাছতলাতেও শুয়ে রাত কাটিয়েছি। ওর বেশি আর দৌড় ছিল না। একসময় ভাবতাম, জাহাজের নাবিকের চাকরি নিয়ে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবো। এই পৃথিবীতে জন্মেছি, আর সারা পৃথিবীটা দেখে যাবো না?

এই সময় সাত-সমুদ্র তেরো নদীর ওপারের দেশ থেকে আমন্ত্রণ! এ যেন এক বেঁটে বাঁটকুলের হাত বাড়িয়ে আকাশের চাঁদ ছুঁয়ে ফেলার মতো। দু'বছর আগে বাবা চলে গেছেন। বড় ছেলে হিসাবে মা, ভাই-বোনদের দায়িত্ব আমার ওপর। তবু সবকিছু টান অগ্রাহ্য করে আমি ভেসে পড়েছিলাম।

এখনকার মতো তখন বিদেশে যাওয়া অহরহ ঘটতো না। ভারত সরকারের অনেক কড়াকড়ি ছিল। পাসপোর্টই পাওয়া যেত না সহজে। বিদেশ থেকে আমন্ত্রণপত্র পেলেও তা খুঁটিয়ে দেখা হতো। তখনকার পশ্চিম-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন খুব বিস্মিত হয়ে বারবার আমাকে জিগ্যেস করেছিলেন, 'তুমি বাংলা কবিতা লেখ, তাও আমেরিকার এক ইউনিভার্সিটি তোমাকে ভাড়া দিয়ে নিয়ে যাবে? থাকার জায়গা দেবে? স্কলারশিপ দেবে? শুধু কবিতা লেখার জন্য? অ্যা?' সত্যিই এটা পল এস্কেলের নিজস্ব পাগলামি, অন্যরা বুঝবে কী করে?

দেশ ছেড়ে গেলে ভারত-সরকার তখন পাথেয় হিসাবে মাত্র আটটি ডলার দিতো। ফরেন এক্সচেঞ্জের এমনই টানাটানি। প্যান-অ্যামের

বিমানে (যে কোম্পানি এখন উঠে গেছে) এক লাফে কলকাতা থেকে করাচি, তারপর বেইরুট, তারপর প্যারিস, তারপর নিউইয়র্ক, কোথাও না থেকে শেষ পর্যন্ত শিকাগোর এক হোটেলে রাত্রিযাপন। সেখানেই আমার আট ডলার শেষ। শুধু টিকিটটি আছে। পরদিন সকালে ছোট বিমানে আয়ওয়া যাত্রা। সত্যি কথা বলতে কী, তখন খুবই বুক দুর্গ দুর্গ করছিল। জীবনে সেই প্রথম এরোপ্লেনে চাপা। তাও অতগুলো জায়গায় বিমান বদলে বদলে এসেছি ঠিকই, কিন্তু এবারে মনে হচ্ছিলো, আমি কপর্দকশূন্য। যদি আয়ওয়ায় আমাকে কেউ নিতে না আসে, তাহলে কী হবে? কোথায় যাবো বা থাকবো, জানি না। কী করে এয়ারপোর্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছোব। ট্যাক্সিভাড়া কে দেবে।

বিমানটি ভূমি স্পর্শ করতেই দেখি টারম্যাকের ওপরে এক দীর্ঘদেহী সাহেব সহাস্যে দু'হাত বাড়িয়ে আমায় ডাকছেন। পল এঙ্গেল! এই কাহিনি আমি সবিস্তারে অন্য বইতে লিখেছি।

এবারে একেবারে অন্যরকম। ইতিমধ্যে কেটে গেছে সতেরোটি বছর। এখন আর আমি শুধু তরুণ কবিটি নই, গদ্যলেখকও বটে। এবং বিবাহিত। অনেক পরিকল্পনা করে সময় হাতে নিয়ে এসেছি। এখন এদেশে চেনাশুনোও অনেক। ডলারও অতো দুর্লভ নয়। স্বাতীও বেড়াতে খুব ভালোবাসে। তাই যাওয়ার পথে লন্ডন ও প্যারিসে কয়েকটি দিন কাটিয়ে সোজা চলে গেছি কানাডায়। লন্ডনে থাকে ভাস্কর আর প্যারিসে অসীম। এরা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত আর কানাডার এডমন্টনে থাকে স্বাতীর পরের বোন জয়তী আর তার স্বামী ফিজিঞ্জের অধ্যাপক দীপক সরস্বতী। সব জায়গাতেই প্রচুর খাতির। দীপক গাড়ি চালিয়ে, প্রায় তিন হাজার মাইল ঘুরতে ঘুরতে আমাদের পৌঁছে দিলো ক্যালিফোর্নিয়া। সেখানে এক শহরে থাকে ডাঃ মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়। অতি সহৃদয় মানুষ এবং সাহিত্যপ্রেমী।

মদন আমাদের তুলে দিল আয়ওয়াগামী বাস গ্রে হাউন্ডে। দেড় দিনের যাত্রা। মাঝপথে রীতিমতো নাটকীয় ঘটনাও ঘটল। পথে একটা

ভীষণ অ্যাক্সিডেন্ট। আর আমার সিগারেট টানার উপলক্ষে কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে যাওয়া। সেসব ঘটনা আমি ‘তিন সমুদ্র সাতাশ নদী’ নামে বইটিতে লিখেছি। তাই এখানে আর পুনরুক্তি করতে চাই না।

আগের বারে আমি সাউথ ক্যাপিটল নামে একটা রাস্তায় একটা কাঠের বাড়িতে দোতলার অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম। একটিমাত্র ঘর ও রান্নাঘর। ভাড়া পঞ্চাশ ডলার। স্কলারশিপ ছিল আড়াইশো ডলার। তার থেকে অন্তত একশো ডলার বাঁচিয়ে দেশে পাঠাতে হতো মা-ভাই-বোনদের জন্য। তাতেই দিব্যি চলে যেতো। এমনকি মদ-সিগারেটের খরচও কুলিয়ে যেতো। এবারে মেফ্লাওয়ার নামে এক মস্ত বাড়ির সাততলায় দেওয়া হয়েছে অ্যাপার্টমেন্ট। বেশ প্রশস্ত, সাজানো-গুছানো। স্বাতীর খুব পছন্দ হল।

আগেরবার আমার দিনগুলো রসে রসে ভরিয়ে রেখেছিলো মার্গারিট। একসঙ্গে রান্না, খাওয়া-দাওয়ার আড্ডা ছাড়াও তার কাছেই আমার ফরাসি সাহিত্য কিছুটা দীক্ষা। এমন কবিতা-পাগল মেয়ে আমি আর দেখিনি। যেকোনও দৃশ্য, যেকোনও ঘটনা দেখেই তার কোনও না কোনও কবিতা মনে পড়ে। দুজনে পাশাপাশি বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা কবিতা পড়ে যেতাম। আমার হুইস্কি পান সে পছন্দ করতো না। সে আমাকে ওয়াইন বিষয়ে রসিক করে তোলার চেষ্টা করেছিল।

এখানে এসে তো মার্গারিটের কথা মনে পড়বেই। চতুর্দিকে তার স্মৃতি। আমাদের এই বাড়িটার সামনেই ছিপিছিপে আয়ওয়া নদী। শীতকালে পুরোটাই জমাট বাঁধা বরফ হয়ে যায়। তবু তার ওপর দিয়ে হাঁটা রিস্কি। কিন্তু মার্গারিট নিষেধ মানতো না। পল ভের্লেনের কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সে এই নদীর ওপর একাদোক্কা খেলতো।

সঙ্গে স্ত্রী রয়েছে, তবু অন্য একটি মেয়ের কথা চিন্তা করা কি ঠিক? গোপন চিন্তা না, স্বাতী মার্গারিটের কথা সবই জানে।

প্রথমবার অনেকেই আমাকে এ দেশে পাকাপাকিভাবে থেকে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল। সেই সময় ইমিগ্রেশনের তেমন কোনও

সমস্যাই ছিল না। কোনও বিধিনিষেধ ছিল না চাকরি করার। ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামে আগত অন্য কয়েকটি দেশের কয়েকজন লেখক চাকরি জোগাড় করে মিথ্যা বিয়ে করে থেকেও গিয়েছিল। কিন্তু কী যে পোকা ঢুকেছিল আমার মাথায়, বাংলা ভাষায় লেখালেখি করতেই সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই। তাই সেটাই করে যাবো সারাজীবন। কিছু হোক বা না হোক, আর সে জন্য বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যেই থাকতে হবে। তাই আমি জোর করে ফিরে গিয়েছিলাম।

মার্গারিট জিগ্যেস করেছিল, তোমার সঙ্গে আর কী দেখা হবে না?

আমার পক্ষে আবার আমেরিকায় কিংবা ইউরোপে আসার কোনও সম্ভাবনাই ছিলো না তখন। জীবন যে কোনদিকে যাবে, তাও তো জানি না।

মার্গারিট বলেছিল, তুমি আসতে না পারো আমি যাবো। এখানকার পড়াশুনার পাট চুকিয়ে আমি চাকরি নেবো আলিয়াজ ফ্রাঁসেজে। প্রথম পোস্টিংই হবে কলকাতা। কী, ভালো হবে না?

মার্গারিট তখন পি এইচ ডি করছিল এবং আংশিক সময়ের জন্য পড়াচ্ছিলো ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু তার কলকাতায় আসা ক্রমশ পিছিয়ে যেতে লাগলো। পি এইচ ডি শেষ করতে অসুবিধা হচ্ছিলো কী যেন। চিঠিতে যোগাযোগ ছিল নিয়মিত। তার চিঠি তো পাগলের চিঠি। একই দিনে তার তিনখানা চিঠিও পেয়েছি। এরোথামের চিঠি, একটার পর একটা ক্রমশ দেওয়া।

আমার সব খবর সে জানতো। স্বাতীর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার কথাও তাকে জানিয়েছিলাম। তারপর এক বছরের মধ্যে স্বাতীর সঙ্গে বিয়ের সব ঠিকঠাক। সে কথা মার্গারিটকে জানাতে সে কী খুশি। আমিও স্বাতীর কাছে মার্গারিটের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা গোপন করিনি। কেউ না কেউ পরে বলে দিতেই পারে। নিজের থেকে বলাই সঙ্গত। স্বাতীর প্রতিক্রিয়াটি চমৎকার। সে বলেছিল, 'বিয়ের আগে

কোন কোন মেয়ের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক হয়েছিল, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। আমারও তো একটু আধটু এরকম হয়েছিল। তবে সব শুনে মনে হচ্ছে, এই মার্গারিট মেয়েটি খুব ভালো। ওর সঙ্গে পরিচয় না হলে তুমি হয়তো বথে যেতে পারতে!’

কথাটি ঠিক। সে সময়ে আমার স্বভাবে অনেক উদ্দামতা ছিল। কিন্তু মার্গারিট আমাকে সামলে রাখতো। কোনও পার্টিতে আমাকে বেচাল হতে দিতো না। অন্য কোনও মেয়ে বেশি আদুরেপনা করলে তার পাশ থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যেতো। সবসময় আমাকে জ্ঞান দিয়ে বলতো, তুমি তো একজন কবি! তুমি তো সাধারণ মানুষ নও! তার পাল্লায় পড়ে আমার মদ্যপান কমে গিয়েছিল। প্রতি রাত্রেই কিছু না কিছু লিখতাম। ‘আমি কীরকমভাবে বেঁচে আছি’ নামের বইটার অধিকাংশ কবিতা আয়ওয়ায় বসে লেখা।

মার্গারিট চিঠি লিখতো স্বাতীকে। স্বাতীও উত্তর দিয়েছে। এবং বিবাহের এক বছরের মধ্যে আমাদের ছেলে পুপলু জন্মায়। সে খবর পেয়ে মার্গারিটের সে কী উচ্ছ্বাস! একটা খামে বেশ কিছু ডলারের নোট ভরে পাঠিয়ে সে লিখেছিল, ‘আমি ওর গডমাদার। এইটুকু আমার আশীর্বাদ!’ ওইভাবে টাকা পাঠানো সম্পূর্ণ বেআইনি। কিন্তু ওই মেয়ে সেসব গ্রাহ্য করে না।

তারপরেই মার্গারিটের চিঠি একেবারে বন্ধ। আমি চিঠি লিখলে উত্তর নেই। তখন টেলিফোন এমন সুলভ ছিল না। তবু এক-দু’বার ফোন করলাম। ওই নম্বরে কেউ থাকে না। কী হল মেয়েটার?

এর মধ্যে আমার পর জ্যোতির্ময় দত্ত, শঙ্খ ঘোষ, দীপক মজুমদার গেছে আয়ওয়াতে। এদের সকলের সঙ্গেই মার্গারিটের পরিচয় হয়েছিল। শঙ্খ ঘোষ তাঁর একটি বইতে লিখেছেনও মার্গারিটের কথা। দীপক তার স্ত্রী সুপ্রিয়াকে দেশে রেখে চলে গিয়েছিল আমেরিকায়। তারপর দীপকের যা স্বভাব, অনেকদিন স্ত্রীকে কোনও চিঠি লেখে না। সুপ্রিয়ার চিঠির

উত্তরও দেয় না। তার কোনও অসুখ-বিসুখ, বিপদ আপদ হল কী না, তা নিয়ে চিন্তা তো হবেই। সুপ্রিয়া আমার কাছ থেকে মার্গারিটের ঠিকানা নিয়ে দীপকের খবরাখবর জানবার জন্য চিঠি দিলো। মার্গারিট উত্তরও দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু মার্গারিটের যা হাতের লেখা, তা কিছুই বুঝতে পারেনি সুপ্রিয়া। সুতরাং সে চিঠি পড়ে দেবার জন্য ডাক পড়লো আমার। সুপ্রিয়াদের বাড়ির ছাদে বসে গোপনে পড়া হল সেই চিঠি। সেই চিঠির বিষয় কী ছিল, তা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

এরা কেউই আর মার্গারিটের খবর জানে না। তবে কী অন্য ছেলের সঙ্গে মার্গারিটের প্রেম হল? বিয়েও হয়ে গেছে? তা তো হতেই পারে। কিন্তু মার্গারিটের সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক, তাতে সে তার বিয়ের খবর জানাবে না কেন? আমি তো জানিয়েছি। তবে কী সে এমন কাউকে বিয়ে করেছে, যে আমাকে চেনে এবং আমাকে খুবই অপছন্দ করে? আমার সঙ্গে মার্গারিটের কোনও সম্পর্ক থাকুক, তা সে চায় না। এটাও ঠিক মানতে পারি না। একটা চিঠি লেখার স্বাধীনতাও তার থাকবে না?

এর একবছর পর পল এঙ্গেল আবার এলেন কলকাতায়। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে এর মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেছে। তিনি এক চীনা লেখিকাকে বিয়ে করেছেন। পল কলকাতায় এসে আমার স্ত্রীকে দেখতে চান। তারপর তিনি যাবেন চীনদেশে তাঁর নতুন শ্বশুরবাড়িতে।

প্রথম দিনেই আমি পল এঙ্গেলকে জিগ্যেস করেছিলাম মার্গারিটের হৃদিসের কথা। পল মার্গারিটকে ভালো চিনতেন, মাঝে মাঝে আমাকে ঠাট্টা করে বলতেন, সুনীল, তুমি একটা ফরাসি মেয়ের জাদুতে মুগ্ধ হয়ে রইলে? আর কোনও মেয়ের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হল না? আমেরিকায় এসে কোনও আমেরিকান মেয়েকে তুমি চিনলেই না?

এবারে আমার প্রশ্ন শুনে পল ভাসাভাসা ভাবে বললেন, আমি ঠিক জানি না। ও তো ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের নয়। তাই অনেকদিন দেখা হয় না। কী জানি...

ততোদিনে সত্যজিৎ রায় আমার দু'টি উপন্যাস নিয়ে ফিল্ম করেছেন। পল সত্যজিৎ রায়ের কোনও ছবি দেখিনি। সৌভাগ্যক্রমে সেইসময় গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিউট অব কালচারে 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিটা দেখানো হচ্ছিলো। আমার উপন্যাসের ছবি শুনে পল খুবই উৎসাহী। তাকে নিয়ে দেখতে গেলাম।

তারপর কী কলেঙ্কারি! সেটা সত্তরের দশকের গোড়ার দিক। লোডশেডিংয়ের উৎপাত সবে শুরু হয়েছে। ফিল্মটা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিদ্যুৎ উধাও। তারপর জেনারেটর চালানোর চেষ্টা হল। সে জেনারেটরেরও অবস্থা ভালো নয়। একটুখানি চলে, আবার বন্ধ হয়ে যায়। আবার চলে, আবার বন্ধ। বিতকিচ্ছিরি ব্যাপার। পল এঙ্গেল আমার দিকে করুণভাবে তাকালেন। অর্থাৎ তাঁর আর ধৈর্য থাকছে না। তাছাড়া এ. সি বন্ধ, পাখা বন্ধ। তিনি কুলকুল করে ঘামছেন। আমি বললাম, চলুন, উঠে পড়ি। আর এ ফিল্ম দেখার আশা নেই।

অঙ্ককার সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে পা টিপে টিপে নামছি, হঠাৎ পল এঙ্গেল আমার কাঁধে হাত দিয়ে ধীর-স্বরে বললেন, সুনীল, তুমি মার্গারিট ম্যাথিউয়ের কথা জিগ্যেস করেছিলে। আমি তোমাকে ঠিক উত্তর দিইনি। তুমি মনে দুঃখ পাবে, সামথিং টেরিবল হ্যাজ হ্যাপেনড টু হার...প্রিজ, তুমি আর কিছু জিগ্যেস করো না। আমি বলতে পারবো না।

পল এঙ্গেলের অবিকল ভাষা আমার আজও মনে আছে। 'সামথিং টেরিবল হ্যাজ হ্যাপেনড টু হার'...এর মানে কী? মেয়েটা মরে গেছে? কোনও দুর্ঘটনা? কেউ খুন করেছে? সেটাই আমার জানা হয়নি।

দ্বিতীয়বার আয়ওয়া শহরে এসে এই কথাটাই আমার বারবার মনে পড়তে লাগলো। মার্গারিটের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। একটি জলজ্যান্ত মেয়ে কী এমনি এমনি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে?

এখানকার পড়াশুনোর পাঠ শেষ করে মার্গারিট দেশেও ফিরে যায়নি

ফরাসি দেশে মার্গারিটের বাড়ির ঠিকানা আমি জানতাম। লুদ্যা নামে একটি গ্রাম, একবার সেখান থেকে সে আমাকে চিঠি লিখেছিল। তা মা-বাবা তখনও বেঁচে। মার্গারিটের খবর না পেয়ে আমি ওর বাবাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। উত্তর আসেনি অবশ্য। হয়তো ওঁরা ইংরাজি বুঝতে পারেন না। দেশে ফিরে এলেই বা মার্গারিট আমাকে চিঠি লেখা বন্ধ করবে কেন? অত লেখাপড়া শিখে সে বাড়িতে বসে থাকবে? তাও তো স্বাভাবিক নয়। তাছাড়া ‘সামথিং টেরিবল...’ বলতে তো দেশে ফিরে যাওয়া বোঝায় না।

একদিন স্বাতীকে নিয়ে বেরুলাম, আমার পুরোনো আস্তানাটা দেখাবার জন্য। আশ্চর্য ব্যাপার, আয়ওয়া ছোট শহর, আমার স্মৃতিতে সব জ্বলজ্বল করছে, তবু সে জায়গাটা আমি খুঁজেই পাই না। ঠিকানা স্পষ্ট মনে আছে, থ্রি ও থ্রি, সাউথ ক্যাপিটল। এখানকার প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই একটা উঁচু ডোমওয়ালা বাড়িকে বলে ক্যাপিটল, এখানকার ক্যাপিটলটা ঠিকই আছে, দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু রাস্তাটা গেল কোথায়?

আমার সেই বাড়ি থেকে বেরিয়েই একটা বড় রাস্তা, বাঁ দিকে অদূরে নদী, তার উপর ব্রিজ। সেই ব্রিজের ধারে কাঁকড়া উইপিং উইলো গাছ, ডান পাশের একটা রাস্তা দিয়ে আমি হেঁটে যেতাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। বড় জোর পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। সে রাস্তাটাও চিনতে পারছি না। এই অঞ্চলটাতেই সব কিছু ভেঙেচুরে নতুন রাস্তা হয়েছে, কাঠের বাড়িগুলো উধাও, সব বড় বড় আধুনিক কেতার দালান। চেনা মুশকিল।

এ অ্যান্ড পি নামে একটা মস্ত সুপার মার্কেটে আমি বাজার করতে যেতাম। সেটাই বা গেল কোথায়? একজন পথচারিকে জিগ্যেস করে জানলাম, এ অ্যান্ড পি উঠে গেছে। তার আগে অন্য দু’জন পথচারি এ অ্যান্ড পি’র নামও শোনেনি। এ দেশে কত ব্যবসা হঠাৎ হঠাৎ উঠে

যায়। এ অ্যান্ড পি'র পুরো নাম আটলান্টিক অ্যান্ড প্যাসিফিক। অর্থাৎ দেশের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত ছড়ানো বহু চেইন স্টোর্স। এখন একটাও নেই! এখন কে মার্ট, উলওয়ার্থ এইসব দোকান। শুধু তাই নয়, আয়ওয়া শহরের রেল স্টেশনও উঠে গেছে!

রেল স্টেশনও উঠে যায়? এখন এমনই গাড়িভিত্তিক জীবন, বিমান ভাড়াও এত কম যে কেউ আর ট্রেনে যাতায়াত করতে চায় না।

আনন্দের একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি স্বাতীকে বললাম, খুব সম্ভবত এখানেই ছিল আমার আগের বাড়ি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দৌড়ে চলে আসতাম চিঠির বাস্তু দেখার জন্য। দেশ থেকে একটা চিঠি এলে কী যে আনন্দ হতো!

স্বাতী জিগ্যেস করলো, মার্গারিট কি এ বাড়িতে থাকতো?

আমি বললাম, না। আমরা কিছু লিভ টুগেদার করতাম না। তখন ও ব্যাপারটা প্রকাশ্যে ঠিক চালু হয়নি। মার্গারিট থাকতো হস্টেলে। মেয়েদের হস্টেলে।

সেই সময় মেয়েদের হস্টেল আর ছেলেদের হস্টেল আলাদা ছিল। এখন একই সঙ্গে। কেউ কারুর সঙ্গে যদি প্রেম করতে চায়, তাহলে এ বাড়ি থেকে ও বাড়িতে যাওয়া-আসার সময়টা বেঁচে যায়। এখন আমরা যে মে ফ্লাওয়ার নামে অট্টালিকায় উঠেছি, তাতে বহু ছাত্র ও ছাত্রীও থাকে পাশাপাশি ঘরে। কে কার ঘরে যাচ্ছে, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

স্বাতী আবার জিগ্যেস করলো, সে আমলের কেউ নেই? তাদের কেউ বলতে পারবে না মার্গারিটের কী হয়েছিল?

বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক শহরের চরিত্রই আলাদা। কেউই এখানে বেশিদিন থাকে না। ছাত্র-ছাত্রীরা তো চলে যাবেই। অধ্যাপকরাও এক বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ থাকলে তাঁদের বদনাম হয়ে যায় অন্যান্য অধিবাসীরাও অনবরত বাড়ি বদল করে। শহর বদল করে

একমাত্র পল এস্গেলই এখানে রয়ে গেছেন। আর সব অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাই আমার অচেনা। পিটার আর মেরি নামে এক দম্পতিকে চিনতে পেরেছি।

এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নয়, কর্মচারি। কোন টানে এরা এতদিন রয়ে গেছে জানি না। পিটার আর মেরি আমেরিকান নয়। ভারতের গোয়া অঞ্চলের ক্রিস্চান। আমাকে দেখে চিনতে পারলেও তারা মার্গারিটের কথা মনে করতে পারেনি।

আমার কেমন যেন জেদ চেপে গেল। মার্গারিটের সঠিক খবরটা জানতেই হবে। সেই সঙ্গে আরও একজনের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে। পল এস্গেলের প্রাক্তন স্ত্রী মেরি। সে কোথায়? সে আমায় খুব ভালোবাসতো!

পল এস্গেলের আগেকার বাড়িটা ছোট ছিল। এখন বেশ বড় তো বটেই, একটা টিলার উপরে চমৎকার পরিবেশ। এ বাড়ির ডেকে প্রায়ই পার্টি হয়।

আমি যে বছর প্রথম আসি, সে বছর অন্য দেশের আমন্ত্রিত লেখক-লেখিকারা ছিল মাত্র পাঁচজন। এখন প্রকল্পটাই অনেক বড় হয়েছে, এসেছে পঁচিশ জন, তাদের মধ্যে রাশিয়ান ও চাইনিজও আছে। আগে ওই দুটি দেশ অচ্ছুৎ ছিল। কোনও লেখক-লেখিকাই দ্বিতীয়বার ডাক পায় না। আমার বেলায় বলা যেতে পারে স্পেশাল খাতির। পল এস্গেল আমার প্রতি খানিকটা পক্ষপাত করেছেন, তা ঠিক।

এবারে সবাই ঠিক তরুণ নয়। হাঙ্গেরি ও গ্রিসের লেখক দুজন মাঝবয়েসি ও বেশ প্রতিষ্ঠিত লেখক। রুম্যানিয়ার লেখকটি নাকি সে দেশের সেরা নাট্যকার। অল্লবয়েসিও আছে কয়েকজন। যেমন ফিলিপিনস ও আর্জেন্টিনার দুই তরুণী। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য অন্য পুরুষরা ঘুরঘুর করে। তবে সর্বসম্মতভাবে সবচেয়ে রূপসী লেখিকাটির নাম অ্যানা, সে হাঙ্গেরিয়ান লেখকটির স্ত্রী দু'জনের বয়েসের তফাৎ

অন্তত পঁচিশ বছর তো হবেই। এ যেন কোনও অল্পবয়েসি মেয়ে তার প্রিয় প্রধান লেখকের প্রেমে পড়ে হট করে বিয়ে করে ফেলেছে। দু'জনকে পাশাপাশি দেখলে একথা মনে হবেই।

অ্যানার রূপের বৈশিষ্ট্য, তাতে কোনো উগ্রতা নেই, একেবারেই মেমসাহেব-সুলভ নয়। সাধারণ মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি লম্বা, ফরসা অবশ্যই, কিন্তু ভারি স্নিগ্ধ, গৌরবর্ণ, টানা টানা চোখ, চোখের মণি দুটো কালো। ঢালের মতো চুল ছড়িয়ে থাকে তার পিঠে। স্বাতী ও আমার সঙ্গে প্রথম থেকেই তার বেশ ভাব হয়েছে। প্রায়ই সে আমাদের ঘরে গল্প করতে আসে। তার একটা কারণ, ভারত সম্পর্কে সে আগ্রহী। তার ধারণা, তার শরীরে আছে ভারতীয় রক্ত, (এখানকার ভাষায় জিন)। সে মনে করে, তার দিদিমা কিংবা ঠাকুমা জিপসি ছিল। আর জিপসিরা তো ভারত থেকে ইউরোপে এসেছে। অনেকে এরকম মনে করে।

পল এঙ্গেলের বাড়ির ডেকে প্রায়ই আড্ডাতে নানারকম হাসি-ঠাট্টা, গল্প, নাচ-গান হয়। মদ্যপানের ব্যবস্থা তো আছেই। স্বাতী এখানে বেশ জনপ্রিয়। তার নতুন নতুন শাড়ি দেখে সবাই মুগ্ধ। তার চেহারা দেখেও বোঝার উপায় নেই যে, তার একটি তেরো বছরের ছেলে আছে। বেশ কিছু যুবক তার সঙ্গে প্রেম প্রেম ভাব করে। সেটাই স্বাভাবিক। স্বাতীর তুলনায় আমি বেশ অনাকর্ষণীয়। এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকি হাতে গেলাস নিয়ে। কারুর সঙ্গেই নিজের থেকে কথা বলি না। দু'একজন আমাকে বলেওছে, তুমি কি খুব বোরড হচ্ছেো নাকি? পল এঙ্গেলও বললেন, এ কী সুনীল, তুমি আগেরবার কত ছটফটে ছিলে, সবার সঙ্গে ভাব করতে, হইচই করতে, এবার তোমার কী হয়েছে? এত চুপচাপ, এত শান্ত!

কেন এবার আমি এরকম, তা আমি নিজেই জানি না! সবসময় কী মার্গারিটের চিন্তা করছি? মোটেই তা না। মাঝেমাঝে মনে পড়ে ঠিকই,

কিন্তু কোনও অবশেষনের ব্যাপার নেই। তার সঙ্গে আর দেখা হবে না, তা তো বুঝেই গেছি। তবে আগেরবার আমি ছিলাম অবিবাহিত তরুণ, ভবিষ্যতের কোনও দিশা নেই, শরীর ভরা চাঞ্চল্য এবং সব বিষয়ে অদম্য কৌতূহল। এখন আমি মধ্যবয়স্ক, বিবাহিত, দায়িত্বশীল। ছুটফুটে ভাবটা একেবারেই নেই। কী আর করা যাবে! আগে আমি চেষ্টায়ে চেষ্টায়ে অনেক গান গাইতাম সব পার্টিতে বেসুরো গলায়। এখন আর মোটেই গলা খুলি না।

পলের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম হুয়াং লিং। উচ্চাকাঙ্ক্ষী লেখিকা। প্রায়ই নিজের লেখার কথা বলেন। বেশ কয়েকটি বই বেরিয়েছে। গাঁড়াগোড়া চেহারা। গৃহকর্ত্রী হিসাবেও খুব শক্ত। নিজে রান্না করেন। পার্টিতে নিজের হাতে সবাইকে খাবার তুলে দেন। কার কখন পানীয় লাগবে সেদিকে নজর রাখেন। তাঁর আতিথেয়তায় সবাই মুগ্ধ।

হুয়া লিংকে দেখতে দেখতে আমার বারবার পলের আগের স্ত্রী মেরির কথা মনে পড়ে। মেরির ছিল ছোটখাটো শরীর। সেই যাকে বলে, একেবারেই অসংসারী নারী। সবসময় প্যান্ট-শার্ট পরা, আমি মেরিকে কখনও ফ্রক বা স্কার্ট-ব্লাউজ পরতে দেখিনি। হঠাৎ দেখলে পুরুষ বলে মনে হত। রান্নাবান্নায় একেবারেই মন ছিল না। মেরির। এরকম পার্টির দিনে একজন মেইড এসে বিবিধ শুকনো খাবার প্রস্তুত করে রেখে যেতো টেবিলের ওপরে। মেরি বলতেন, যার যা খুশি প্লেটে করে তুলে নাও। নিজে এককোণে বসে অনবরত জিন অ্যান্ড টনিক পান করে যেতেন। শেষের দিকে মাতাল হয়ে পড়তেন রীতিমতো।

সেবারে পল এস্টেলের বয়েস ছিল পঞ্চাশ-একান্ন। বেশ দীর্ঘকায়, সুপুরুষ, প্রাণবন্ত, হাসিগল্পে সবসময় জমিয়ে রাখেন। মেয়েরা ওকে খুব পছন্দ করে। সেই তুলনায় মেরিকে মনে হত, অকালে শুকিয়ে যাওয়া বুড়ি।

পল এস্টেল তাঁর স্বপ্নের প্রজেক্ট ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামের টাকা তোলার জন্য প্রায়ই বড়লোক চাষীদের বাড়িতে হানা দিতেন।

আয়ওয়ার কোনও কোনও চাষী বিশাল ধনী, বাড়ির সামনে মোটরগাড়ির বদলে দুটো-তিনটে প্লেন থাকে। বৈঠকখানায় পিকাসো— মাতিসের আসল ছবি। পল দু-তিনদিনের জন্য এরকম অভিযানে বাইরে গেলে মেরি আমাকে সন্কেবেলা একা ডাকতেন।

তখন ওদের জীবন-কাহিনি জেনেছি। সে কাহিনি গল্পেরই মতন।

এই আয়ওয়া রাজ্যেই একটা ছোট শহরে পল আর মেরির জন্ম। দুজনে প্রায় একই বয়েসি। একসঙ্গে খেলাধুলো আর পড়াশুনো করেছে। বাইশ-তেইশ বছর হতে না হতেই অবধারিতভাবে বিয়ে করেছে দুজনে। মেরি তখন কয়েকমাসের গর্ভবতী। পল ছাত্র হিসাবে খুব ভালো। তাঁর উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা। এসব দেশে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বাবা-মায়ের টাকায় পড়াশোনা করে না। পড়তে পড়তেই নিজেদের রোজগার করতে হয়। সেইজন্যই এদেশের উচ্চশিক্ষার ছাত্রছাত্রীরা যতোই হইহল্লা করুক, তারা পড়াশুনায় ফাঁকি মারে না। কারণ, তারা জানে তাড়াতাড়ি পাশ করতে না পারলে নিজেদেরই ক্ষতি। মেরি বলেছিল, সন্তান মানুষ করা ও সংসার চালানোর দায়িত্ব তার। পলকে ও ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে না। সে পড়াশুনো চালিয়ে যাক। ততোদিনে ওদের একটি মেয়ে জন্মেছে। সেই মেয়েকে ট্যাকে নিয়ে নানা চাকরি করতে হয়েছে মেরিকে। কখনও রেস্টোরাঁয় বাসন মাজার কাজও। কয়েক বছরের মধ্যে পল প্রফেসর হয়েছিলেন। তাঁকে ইংলন্ডেও যেতে হয়। এদিককার সবকিছু সামলেছেন মেরি। মেরির আত্মত্যাগেই পল হয়েছেন বিশিষ্ট বিদ্বান এবং কবি। সমাজে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। আর ক্রমাগত আত্মত্যাগ করতে করতে মেরির রূপ-যৌবন ক্ষয়ে গেছে। এরপরও ওঁরা দু'জন আর কতদিন একসঙ্গে থাকতে পারবেন?

আমার তখন তিরিশের নিচে বয়েস। প্রেম-ভালোবাসার কথায় অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু মেরিকে দেখার পরেই সে বিশ্বাস খানিকটা চলে গিয়েছিল। শুধু প্রেমের ওপর নির্ভর করে কী সারা জীবন কাটানো যায়?

বিয়ে ও সংসারধর্মে প্রবেশ করলে নিশ্চিত প্রেম টিকিয়ে রাখার জন্য আরও অনেকটা খুঁটি লাগে। সে খুঁটিগুলোর নাম স্নেহ, মমতা, কৌতুক, নির্ভরশীলতা। শরীর নাই বা সাড়া দিলো, তবু কৌতুকবোধ তো সরিয়ে দিতে পারে অনেক মেঘ। পল আর মেরির মধ্যে এসব কিছুই নেই। পলের মন যতই বাইরে বাইরে, মেরির মন ততোই অযৌক্তিক ঈর্ষাপরায়ণ। পল কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা বললেই, সে সহ্য করতে পারে না। বাড়িতে অতিথিদের সে অপমান করে। ইচ্ছা করে নেশাগ্রস্ত হয়। এসবের কারণও তো বোঝা যায়। এর মধ্যে নাকি, পলের কোটের পকেটে একাধিক মেয়ের প্রেমপত্র মেরি দেখে ফেলেছিল।

আমি ফিরে আসার পর খবর পেয়েছিলাম, মেরিকে ডিভোর্স করে পল এক চিনে নারীকে বিয়ে করেছেন। আয়ওয়ার মতো জায়গায় ডিভোর্স ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক নয়। আমেরিকার মানুষেরা যখন-তখন ডিভোর্স করে, এই হলিউড ধারণা সঠিক নয় মোটেই। মিডওয়াস্টার্নের মতো অঞ্চলে মানুষ এখন বেশ রক্ষণশীল। সেদিক থেকে পল একটা দুঃসাহসিক কাজই করে ফেলেছেন।

কিন্তু মেরি এখন কোথায়? তাঁর যৌবন নেই, স্বাস্থ্য নেই, তিনি এখন একলা থাকবেন কী করে? এদেশের নিয়ম হচ্ছে, কোনও নারী বা পুরুষকে তার প্রাক্তন স্বামী বা স্ত্রী সম্পর্কে জিগ্যেস করা ভদ্রতাসম্মত নয়। ওরকম কৌতুহল প্রকাশ করতে নেই। অন্য দু'একজনের মুখে শুনলাম, মেরি এখনও বেঁচে আছেন ঠিকই, কিন্তু এ শহরে নেই। অন্য কোথাও থাকেন।

মেরি চিনতেন মার্গারিটকে। ওর সম্পর্কেও মেরির ঈর্ষাবোধ ছিল। দু'একবার পার্টিতে মার্গারিটকে দেখেছিলেন আমার সঙ্গে। একবার সন্ধ্যাবেলা আমার বাড়িতে ফোন করে, আমার বদলে মার্গারিটের গলা শুনেছিলেন। তাতেই রাগ করে পরে আমায় বলেছিলেন, তুমি ওই ফ্রেঞ্চ মেয়েটার সঙ্গে সময় কাটাও কী করে? ফরাসি মেয়েরা খুব তরল

স্বভাবের হয়। ওরা যখন-তখন সঙ্গী বদল করে। চান করে না। ওদের গায়ে বিচ্ছিরি গন্ধ! সেই গন্ধের ওপর পারফিউম মাখে, এঃ।

সে যাই হোক, মেরির সঙ্গে একবার দেখা করতে খুব ইচ্ছা করে। একদিন পল এস্কেলের পার্টিতে একজন বহিরাগতকে দেখলাম। পলেরই বয়েসি। মুখটা কেমন যেন চেনা চেনা মনে হল। কোনো বিখ্যাত লেখক? ছবিতে দেখেছি? কিছুতেই মনে পড়ছে না।

পার্টির মাঝপথে পল আমাকে কাছে ডেকে বললেন, সুনীল, একে চিনতে পারছো? ফিলিপ লমবার্ট।

নামটা শুনেও আমার মনে কোনও টুং শব্দ হল না। সে ভদ্রলোকও আমায় চেনেন না। শুকনো গলায় বললেন, হাই!

পল বললেন, ফিলিপ একসময় আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী ছিল। এখন টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে। এখানে ওর একটা বাড়ি আছে। সেটা বিক্রি করতে এসেছে।

ভদ্রলোক বললেন, ভালো খব্বের পাচ্ছি না।

পল বললেন, জঙ্গলের মধ্যে চমৎকার বাড়ি। আমার পয়সা থাকলে কিনে নিতাম। সুনীল, তোমার মনে নেই, আগেরবার তুমি যখন এসেছিলে, এর বাড়িতে একটা দারুণ জমজমাট পার্টি হয়েছিল? তুমি গিয়েছিলে আমার সঙ্গে।

এবার আমার মাথার মধ্যে ঝন করে উঠলো। ঠিকই তো, গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা অতি সুদৃশ্য বাড়ি। প্রচুর বড় বড় কাঠবেড়ালি দৌড়াদৌড়ি করছিল মনে আছে। ঐর আসল নাম, ফিলিপ লমবেয়ার। আমেরিকায় এসে ফিলিপ লমবার্ট হয়েছেন। ইনি ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসি ডিপার্টমেন্টের প্রধান। ঐর অধীনেই পি এইচ ডি করেছিল মার্গারিট।

আমি ওঁর কাছ ঘেঁষে বসে রইলাম।

একসময় ওঁর গেলাস খালি দেখে আমি উঠে গিয়ে এক গেলাস রেড ওয়াইন নিয়ে এসে জিগ্যেস করলাম, ডঃ ল্যামবেয়ার, আপনার কি মনে

আছে মার্গারিট ম্যাথিউ নামে একটি ছাত্রীর কথা? অবশ্য, এতগুলো বছরে আপনার কাছে কত ছাত্র-ছাত্রীই তো এসেছে, সকলের কথা মনে রাখবেন কী করে? তবে, ওই মেয়েটি অনেক বছর ধরে আপনার কাছে ফরাসি সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছিল...

পাইপ টানতে টানতে ল্যামবেয়ার নির্লিপ্ত গলায় বললেন, হ্যাঁ, মনে আছে মার্গারিটের কথা।

আমি আবার জিগ্যেস করলাম, সে তো এখানে আর নেই। এখন কোথায় আছে, তা কী আপনি বলতে পারেন?

তিনি বললেন, না, তা বলতে পারি না। তবে তুমি কি ডোরি ক্যাটজ নামে আরেকটি মেয়েকে চিনতে?

আমি বললাম, ডোরি, হ্যাঁ, চিনি।

তিনি বললেন, ওরা দু'জনে যে যেখানেই থাকুক, সবসময় যোগাযোগ রাখে। ডোরি নিশ্চয়ই জানবে। আমি তোমাকে ডোরির টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছি। সে থাকে অ্যারিজোনায়।

পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবই বার করে তিনি কয়েকবার পাতা উলটোলেন। তারপর বললেন, তার নাম্বারটা এখানে নেই দেখছি। বাড়িতে নিশ্চয়ই আছে। ঠিক আছে, আমি কালকেই ফিরছি। ফিরে গিয়ে ডোরির নাম্বারটা তোমাকে জানিয়ে দেব। তুমি কি জানো, ডোরি এখন আর হাঁটতে পারে না?

ফেরবার পথে গাড়িতে স্বাতী আমাকে জিগ্যেস করলো, ডোরি কে?

আমি বললাম, ডোরি নামে আমার এক বান্ধবী ছিল, তার কথা তোমাকে আগে বলিনি?

স্বাতী বললো, না, এ নাম আমি আগে কখনো শুনিনি।

আমরা আয়ওয়ায় এসে গাড়ি কিনিনি। আমি একসময় গাড়ি চালানো শিখেছিলাম, বটে, কিন্তু অনেকদিন চালাই না। আমাদের দেশে ড্রাইভার রাখা সহজ, খুব বেশি মাইনে দিতে হয় না। তাছাড়া লক্ষ লক্ষ বেকারের মধ্যে অন্তত একজনকে কাজ দেওয়া যায়। এ দেশে শোফার ড্রিভন কার থাকে মাল্টিমিলিওনারদের। আমার পক্ষে এ দেশে গাড়ি চালাবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

কেউ না কেউ আমাদের লিফট দেয়। তাছাড়া পল এস্কেল দুটি ছাত্রকে নিযুক্ত করেছেন, আমন্ত্রিত লেখকেরা বিশেষ প্রয়োজনে তাদের ডেকে সাহায্য চাইতে পারে।

এখন আমরা পার্টির শেষে এরিকের গাড়িতে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরছি। এরিক অবশ্য ছাত্র নয়, ইংরিজি ডিপার্টমেন্টের তরুণ অধ্যাপক। ভারত সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না, তবে জানার খুব আগ্রহ।

যে বাংলা বোঝে না, তার পাশে বসে নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বলা খুবই অভদ্রতা। সুতরাং আমি স্বাতীকে বললাম, ডোরির কথা পরে বলবো। দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর এরিককে জিগ্যেস করলাম, তোমরা একটা নাটকের রিহাসাল দিচ্ছে শুনলাম। কবে স্টেজড হবে?

আমরা যাচ্ছি আয়ওয়া নদীর ধার ঘেঁষে। আমাদের বাসস্থানের নাম মে ফ্লাওয়ার। সেটা আর বেশি দূর নয়। মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে, এরকম ছোট শহরে এসময় বেশি গাড়ি চলে না।

এরিক বললো, সেপ্টেম্বরের সাত তারিখ একটা ছুটির দিন, সেইদিনই স্টেজ করার কথা ছিল। কিন্তু একটি মেয়ে অভিনয় করছিল, সে হঠাৎ শিকাগো চলে গেছে। তাই মুশকিলে পড়ে গেছি। অন্য মেয়েকে ওই ভূমিকায় তৈরি করতে হবে। তারিখ পালটাতে হবে।

স্বাতী বললো, আমি একদিন রিহাসাল দেখছিলাম। সুজান তো খুব ভালো অভিনয় করছিলো। শিকাগো চলে গেল কেন?

এরিক বললো, একটা টিভি কমার্শিয়ালে শুটিং করতে গেছে। আর ফিরবে বলে মনে হয় না।

আমি বললাম, তোমাদের তো নাটকের স্কুল আছে। আরও কত ছাত্রী আছে সেখানে...

এরিক বললো, এটা নাটকের স্কুলের প্রোডাকশান নয়। আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের।

সুনীল, তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি?

অফ কোর্স।

তোমার স্ত্রী সোয়াতি কি এই রোলটায় অভিনয় করতে রাজি হবে? তা হলে খুব ভালো হয়।

সে তো তুমি স্বাতীকে জিগ্যেস করলেই পারো। সে তোমার পাশেই বসে আছে।

আমি তো তোমাদের দেশের নিয়ম জানি না। ভেবেছি যে, স্বামীর কাছ থেকে আগে পারমিশান নিতে হয়!

তোমার কি ধারণা, আমাদের দেশে স্বামীরা যখন বাড়ি থেকে বেরোয়, তখন বউদের দরজায় তালাবন্ধ করে রেখে যায়?

এরিক খানিকটা বিভ্রান্তভাবে বললো, তা আমি ঠিক জানি না।

আমি হাসতে হাসতে জিগ্যেস করলাম, তুমিও কি সেই দলে, যারা মনে করে কলকাতার রাস্তায় এখনো সাপ আর বাঘ ঘুরে বেড়ায়, ফুটপাথে মানুষ মরে পড়ে থাকে, আর উলঙ্গ ফকিররা যাকে-তাকে হিপনোটাইজ করে দেয়?

এরিকও হাসতে হাসতে বললো, গড নো! আমি জানি, কলকাতা একটা আধুনিক মস্ত বড় শহর। আমি অ্যালেন গিনসবার্গের ইন্ডিয়া জার্নাল পড়েছি। তাতে কলকাতা সম্পর্কে অনেক কথা আছে।

আমি বললাম, আমাদের দেশে এককালে মেয়েদের ওপর পুরুষরা অনেক অত্যাচার করেছে। এখন তার শোধ নিচ্ছে মেয়েরা। এখন মেয়েদের ছকুমই পুরুষদের শুনতে হয়। আমি তো আমার বউয়ের ভয়ে কাঁপি। সে চাকরি করেছে, দু'একটা অভিনয়ও করেছে, আমার অনুমতি নেবার কোনো প্রশ্নই ওঠেনি।

এরিক বললো, উনি নাটকে অভিনয় করেছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ। দু'তিনটে নাটকে...বেশ বড় স্টেজে... হাততালি পেয়েছে অনেকগুলো...

স্বাতী লজ্জা পেয়ে বললো, যাঃ, সে তো অনেকদিন আগে...

এরিক বললো, ম্যাডাম, আপনি যদি আমাদের এই নাটকটায়...

স্বাতী বললো, না, না, আমি ইংরিজি নাটকে অভিনয় করবো কী করে? আমার অ্যাকসেন্ট ঠিক হবে না...

আমি বললাম, অ্যাকসেন্ট ওরা শিখিয়ে-টিকিয়ে ঠিক করে দেবে।

এরিক বললো, অ্যাকসেন্ট নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। এ নাটকের ইন্টারন্যাশনাল কাস্টিং, একটি ছেলে আছে আর্জেন্টিনার, একটি মেয়ে ফিলিপিনসের, আর একটি মেয়ে জাপানের, স্টোরিটাও অ্যাবসট্র্যাকট ধরনের, পার্টিকুলার কোনো দেশের নয়, যে কোনো দেশেরই হতে পারে...

এরিক এত উৎসাহ পেয়ে গেল যে আমাদের বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে বললো, আমি কি তোমাদের সঙ্গে আর একটু বসতে পারি? তোমাদের পক্ষে কি বেশি রাত হয়ে গেছে?

সাড়ে বারোটা বাজে। বেশি রাতেই আড্ডা জমে। কখনো কখনো আমরা আড্ডা দিতে দিতে খেয়ালই করি না যে, জানলার বাইরে পাখি ডাকতে শুরু করেছে।

আমি বললাম, না, না, এসো, এসো। লেটস হ্যাভ অ্যানাদার ড্রিংক।

ওপরে এসে এরিক মহা উৎসাহে নাটকটির বিষয়ে বোঝাতে লাগলো। স্বাতীকে সে রাজি করাবেই।

ব্যাপারটা আমার ভালো লাগলো এই কারণে যে স্বাতী শুধু একজন লেখকের স্ত্রী হয়ে সেজেগুজে ঘুরে বেড়াবার বদলে ওর নিজেরও একটা আলাদা পরিচয় থাকবে।

পরদিন থেকেই স্বাতীর রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল। ও বেরিয়ে যায় দুপুরবেলা, তখন আমি টেবিলে লিখতে বসি। আগেরবার আমি শুধুই কবিতা লিখতাম, সারাজীবন শুধুই কবিতা লিখবো, গদ্য-টদ্য লিখে সময় নষ্ট করবো না, এইরকমই ছিল ইচ্ছে। দেশে ফেরার পর সম্পূর্ণ বেকার অবস্থায় বাধ্য হয়েই সংবাদপত্রে কলাম লিখতে শুরু করি। তারপর সম্পাদকের অনুরোধে গল্প-উপন্যাস লেখার শুরু। সত্যজিৎ রায় আমার দুটি উপন্যাস অবলম্বনে দুটি সিনেমা তৈরি করার পর সম্পাদকরা আমাকে আরও উপন্যাস লেখার জন্য চাপ দিতে শুরু করলেন। এখন আমি নিয়মিত গল্প-উপন্যাস লিখতে বাধ্য। সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় আমার একটা ধারাবাহিক উপন্যাস বেরোচ্ছে। আমি আমেরিকা থেকে তার ইনস্টলমেন্ট লিখে পাঠাচ্ছি।

এখনও যে দু'একটা কবিতা লিখি মাঝে মাঝে, তা শুধু রাত্তিরবেলা। দিনেরবেলা গদ্য।

জানলার কাছে টেবিল। এই ঠাণ্ডার দেশে জানলা খোলার কোনো উপায় নেই। পরদা সরালে বাইরে দেখা যায় একপাশে বেশ কয়েকটা মেপল গাছ, আর এক পাশে এই বাড়িটারই আর একটা উইং, আমার ঠিক সাততলার ঘরের লেভেলে ওদিকের একটা ঘর। ওদিককার জানলার পরদা সবসময় খোলা থাকে, ওই ঘরটিতে একটি মেয়ে থাকে, একা। সে প্রায়ই শুধু ব্রা আর ছোট একটি প্যান্টি পরে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। বোধহয় স্নান করে বেরুবার সময় সেসবও অঙ্গে থাকে না।

লেখার সময় মাঝে মাঝে থেমে, বাইরের দিকে তাকিয়ে তো চিন্তা করতেই হয়। কিন্তু আমি একজন বিবাহিত মধ্যবয়সী পুরুষ, স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে এক নির্বসন যুবতীর দিকে প্যাটপ্যাট করে চেয়ে থাকা মোটেই উচিত নয়। এ কথা মনে পড়তেই আমার হাসি পায়। তবু অর্ধেকটা পর্দা টেনে দিলাম।

জানলার পাশের দেওয়ালে বতিচেল্লির আঁকা একটি ছবির প্রিন্ট ঝুলছে। শুধু একটি মেয়ের মুখ। টিপিক্যাল বতিচেল্লির মেয়েদের মুখ যেমন হয়। ডিমের মতন গড়ন। আজই প্রথম সেই ছবিটার দিকে কয়েকবার চোখ পড়তেই মনে হল, খুতনির দিকটায় যেন অনেকটা ডোরি ক্যাটজ নামে মেয়েটির মিল আছে।

মেয়েটির কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়।

পল এস্কেলের বাড়ির পার্টিতে অধ্যাপক ল্যামবেয়ার ডোরির কথা মনে করিয়ে দিলেন। তারপর আস্তে আস্তে সব মনে আসছে। এর মধ্যে স্বাতীকেও ডোরির কথা বলেছি।

ডোরির নামটা আমার স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতে পারে কিন্তু তার মুখটা আমার কাছে চিরস্মরণীয়।

ডোরিই আমার জীবনে প্রথম এক শ্বেতাঙ্গিনী, যাকে আমি চুমু খেয়েছি। মার্গারিটেরও আগে তার সঙ্গে আমার পরিচয়।

তখন আমি প্রথম এত দূর বিদেশে আসা এক অনভিজ্ঞ উনত্রিশ বছরের যুবক। এ দেশের মানুষের সঙ্গে ঠিক ঠিক ভদ্রতাসম্মত ব্যবহার

করতে হয় কী ভাবে, সে সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা ছিল না। সবসময় থ্যাংক ইউ বলতেও ভুল হয়ে যায়। এক বিলেত ফেরৎ বন্ধু বলে দিয়েছিল, কক্ষনো কোনো পার্টিতে গিয়ে মাতাল হবে না, বাড়ি থেকে বেরুবার সময় তিন-চারখানা বিস্কুটের ওপর পুরু করে মাখন লাগিয়ে খেয়ে নেবে, তাতে বেশি মদ্যপান করলেও নেশা হয় না। আর কোনো মেয়ে, নিজে থেকে হাত না বাড়ালে তার হাত ধরবে না। আলাপের প্রথম তিনদিনের মধ্যে।

প্রথম এসেই ঘর-টর গুছোনো ও রাস্তাঘাট চেনার সুবিধার জন্য পল এঙ্গেল ডোরির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। ডোরি নিজেও একজন কবি এবং ইংরিজি বিভাগের ছাত্রী। বেশ স্বাস্থ্যবতী ও স্মার্ট মেয়ে। বেশি সিগারেট খায়। আমারও তো সেই একই দোষ। প্রথমদিন সে আমাকে সুপারমার্কেটে নিয়ে গিয়ে আমার প্রয়োজনীয় জিনিস-টিনিস কিনিয়ে দিয়েছিল। সন্দের সময় তার অন্য কাজ আছে বলে বিদায় নেবার সময় বলেছিল, আমি আবার কাল আসবো, কাল তোমার সঙ্গে আমার ডেট রইলো।

ডেটিং ব্যাপারটা গল্প-উপন্যাসে পড়েছি, আমাদের দেশে তখনও চালু হয়নি। মেয়েদের সঙ্গে প্রকাশ্যে ঘোরাঘুরিও সম্ভব ছিল না। প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে হতো গোপনে।

পরদিন সন্কে ছ'টা থেকে ডোরি আর আমি বেড়ালাম অনেকক্ষণ। এ দেশে বেড়াবার জায়গার তো অভাব নেই। খুব মনোরম আবহাওয়া ছিল, নদীর ধারেও জোড়ায় জোড়ায় বসে থাকতো অনেকে। ডোরির পৈতৃক বাড়ি মেক্সিকো সিটিতে, মাতৃভাষা স্প্যানিশ। মেক্সিকোর বিখ্যাত কবি অক্কাভিও পাজের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। স্প্যানিশ সাহিত্য নিয়েই কথা হল বেশিরভাগ। স্প্যানিশ সাহিত্য সম্পর্কে তখনও পর্যন্ত আমার জ্ঞান যৎসামান্য। তবে ডোরির ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানের চেয়ে কিছুটা বেশি। আমি তবু হিমেনেথ বা লোরকার কবিতা পড়ে এসেছি, ডোরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও নাম জানে না।

সেইদিনই আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, পকেটে এক গোছা ডলার। দেশ ছাড়ার সময় আমাকে মাত্র আটটি ডলার দেওয়া হয়েছিল, একসঙ্গে এত ডলার আগে দেখিইনি। অনেকদিন দারিদ্র্য সহ্য করেছি, দিনের পর দিন প্রতিটি পয়সা হিসেব করে চলতে হয়েছে। সেদিন হঠাৎ বেপরোয়াভাবে টাকা খরচ করতে ইচ্ছে হল। ডোরিকে ডিনার খাওয়াবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বললাম, সবচেয়ে ভালো হোটেল নিয়ে চলো।

ডোরি প্রথমে আপত্তি করলেও আমি জেদ ধরে রইলাম। বেশ বড় হোটেল গিয়ে প্রচুর মদ্যপান ও দামি খাবার খাওয়া হল। মদ্যপান করলেও পা টলেনি, মাথা ঠিক আছে। অ্যালেন গিনসবার্গ যখন কলকাতায় ছিল, তখন তার কাছে শুনেছিলাম, হলিউডের সিনেমায় যেসব মাতলামি দেখানো হয়, তার অনেকটাই কৃত্রিম। সভ্য সমাজে, বিশেষত লেখক-শিল্পীদের মধ্যে মাতলামিকে এখন নিচু চোখে দেখা হয়। অবশ্য তখন অন্য নেশার চল হয়ে গেছে, পিয়োট, মেক্সালিন, এল এস ডি, মারুয়ানা ইত্যাদি।

হোটেল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডোরিকে পৌঁছে দিলাম তার বাড়ির দরজায়। এক ধাপ সিঁড়িতে উঠে সে বললো, গুড নাইট।

আমিও একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, গুড নাইট।

সে নিজে থেকে হাত বাড়িয়ে দেয়নি, সুতরাং আমার দিক থেকে করমর্দনের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ এখনো তিনদিন কাটেনি।

ডোরি এবার খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, বোকারাম, ডেটিং-এর পর বান্ধবীকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসে যে একটি বিদায় চুম্বন দিতে হয়, তাও জানো না!

সে নিজেই আমার গলা জড়িয়ে কাছে টেনে নিলো।

ডোরির সঙ্গে আমার আরও দিন তিনেক দেখা হয়েছিল, কিন্তু খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা হল না। এর মধ্যেই সে তার বান্ধবী মার্গারিটের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তারপরে ওরা দুজনেই একসঙ্গে

আসতো আমার কাছে, হঠাৎ একদিন মার্গারিট এলো একা, ডোরি আর কোনোদিন আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসেনি কিংবা ফোন করেনি। কোনো পার্টিতে দেখা হলে দু'চারটে ভদ্রতার কথা বলে সরে গেছে।

পরে, অনেকদিন পরে, একটা কথা ভেবে আমার মজা লেগেছে। মার্গারিটের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার সুফল এই যে সে আমাকে ফরাসি সাহিত্যে দীক্ষা দিয়েছে। একসঙ্গে আমরা দুজনে অনেক ফরাসি কবিতা পড়েছি। সে আমাকে ত্রিস্তান ও ইসল্টের কাহিনির অনেকগুলি ভাষ্য জানাবার পর আমি ওদের নিয়ে একটা উপন্যাসও লিখেছি। দু'চারটি ফরাসি গানও শেখা হয়ে গিয়েছিল। আর মার্গারিটের বদলে ডোরির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হলে ফরাসি সাহিত্যের এসব কিছুই আমার জানা হতো না। আমি দীক্ষিত হতাম, স্প্যানিশ সাহিত্যে, অ্যাপলিনেয়ারের বদলে উনামুনোর কবিতা মুখস্থ করতাম।

কিংবা ডোরির সঙ্গে হয়তো আমার ঘনিষ্ঠতা বেশিদিন টিকতো না। চেহারা ও ব্যবহারে সে বেশ আকর্ষণীয় যুবতী হলেও, স্বভাবে বেশি বেশি প্র্যাকটিক্যাল ধরনের। কবিতার আলোচনার চেয়েও কবিতা কী করে ছাপানো যায়, ম্যাগাজিনের সম্পাদকরা কবিদের সম্পর্কে কেমন ব্যবহার করে, এজেন্টরা কেন কবিদের পাত্তা দেয় না, কোন কবির সঙ্গে কার ঝগড়া ইত্যাদি। এসব ব্যাপার সব দেশেই আছে, আমার গুনতে ভালো লাগে না। আর মার্গারিট কবিতা লেখে না, কিন্তু একেবারে কবিতা-পাগল। জাগতিক বিষয়ে প্রায় কিছুই জ্ঞান নেই, টাকাপয়সার হিসেবও বোঝে না। তার সারল্যই আমাকে চুষকের মতন টেনে রেখেছিল।

অধ্যাপক লমবেয়ার আমাকে বলেছিলেন, টেক্সাসে ফিরে গিয়ে আমাকে ডোরির ফোন নাম্বার জানাবেন। কই জানালেন না তো?

এদেশে তো এমন হয় না। কেউ কথা দিলে কথা রাখবেই। এক হতে পারে, উনি আমার ফোন নাম্বার হারিয়ে ফেলেছেন, যোগাযোগ করতে পারছেন না। তাহলে পল এস্কেলকে জানিয়ে দিতে পারেন।

তারপর মনে পড়লো, প্রফেসর লমবেয়ার এখানে এসেছিলেন তাঁর বাড়ি বিক্রি করার জন্য। ফিরে গেছেন, না এখনো রয়ে গেছেন এখানে? লমবেয়ার সেদিন আর একটা সাংঘাতিক কথা বলেছিলেন। ডোরি আর হাঁটতে পারে না। কী হয়েছে মেয়েটার?

ডোরির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ঠিক সতেরো বছর আগে। আমার থেকে চার-পাঁচ বছরের ছোট, মার্গারিট ওর সমবয়সি। অর্থাৎ ওদের এখন বয়েস চল্লিশ-বেয়াল্লিশ হবার কথা। প্রায় যুবতীই বলা যায়। আমিই বরং সাতচল্লিশে পৌঁছে প্রায় প্রৌঢ়ত্বের দিকে চলেছি।

পল এস্পেলকে ফোন করার প্রকৃষ্ট সময় সন্ধ্যা ছ'টা-সাতটা ছ'টা। এই সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে চা পান করতে করতে চিঠিপত্র লিখতে বসেন। প্রতিদিন তিনি গড়ে লেখেন দশটি চিঠি। এখানকার কোনো একটা পত্রিকায় বেরিয়েছে যে পল প্রতি বছর সাতটা তিন হাজার চিঠি লেখেন। সারা পৃথিবীর লেখকদের মধ্যে এটা একটা বিশ্বরেকর্ড।

অ্যালেন গিনসবার্গের সঙ্গে পল এস্পেলের পরিচয় ছিল না। কখনো দেখা হয়নি। তবে পল ট্র্যাডিশানাল ধরনের কবিতা লেখেন, আর অ্যালেনরা শুরু করেছিল বিট জেনারেশানের আন্দোলন, অনেক রকম বেড়া তারা ভেঙেছে। গতবারে অ্যালেন ফোনে আমাকে জিগ্যেস করেছিল, পল এস্পেল মানুষটি কেমন? আমাকে কতখানি অপছন্দ করে জানিও তো! ওর ইউনিভার্সিটিতে আমাদের কবিতা পড়ার জন্য ডাকে না কেন?

এই শেষের প্রশ্নটি পলকে করা মাত্র তিনি বলেছিলেন, সে কি! ওর কবিতা তো ছাত্ররা খুবই শুনতে চায়। কিন্তু ওকে এতদিন ডাকিনি এই ভয়ে যে ডাকলেই তো রিফিউজ করবে! ওরা তো আমার মতন অধ্যাপক-কবিদের একেবারেই পছন্দ করে না।

এর কিছুদিন পরে নিউইয়র্কে অ্যালেন গিনসবার্গের ডেরায় আমি পল এস্পেলকে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই প্রথম ওদের মুখোমুখি

সাক্ষাৎকার। এবং দুজনেই ভদ্রতার প্রতিমূর্তি হয়ে হাতে হাত দিয়ে আলিঙ্গন করলেন।

পলের সঙ্গে অ্যালেনের একটা মিল এই, দুজনেই চিঠি লেখায় নিরলস। তবে পল এঙ্গেলের সব চিঠিই টাইপ করা, আর অ্যালেন অনেক সময় হাতে লিখেও লম্বা লম্বা চিঠি পাঠিয়েছে। এখন বোধহয় কেউ আর কাগজ-কলমে চিঠি লেখে না।

পলকে ফোন করতেই তিনি বললেন, সুনীল! তোমার ফোন পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু এখন একটু ব্যস্ত আছি। তুমি ঠিক আর চল্লিশ মিনিট পরে, না, আধঘণ্টা পরে ফোন করতে পারবে? আচ্ছা, তার দরকার নেই, এখনই বলো...

আমি লজ্জিতভাবে বললাম, না, না, আমি দুঃখিত, তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না, আমার এমন কিছু জরুরি কথা নেই...

পল তবু বললেন, না, না, এখনই বলো, আমার হাতে সময় আছে...

জানি, তাঁর এরকমই স্বভাব। সবসময় ব্যস্ত, আবার প্রত্যেকের ব্যাপারেই খুব আগ্রহী।

আমি বললাম, এমন কিছু জরুরি কথা নেই। আমি জানতে চাইছিলাম, তোমার বাড়ির পার্টিতে দেখা হল, সেই যে ফ্রেঞ্চ প্রফেসর ল্যামবিয়ার, তিনি কি টেক্সাসে ফিরে গেছেন? একটু দরকার ছিল...

পল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, শোনো এখন কটা বাজে? পৌনে সাতটা, তুমি ঠিক সাড়ে সাতটার সময় তৈরি থাকো, তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবো। স্বাতীকেও বলো তৈরি হতে, ঠিক সাড়ে সাতটায়।

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগই দিল না, লাইন কেটে দিল।

সেই সতেরো বছর আগেও পল এঙ্গেল আমার সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করতেন। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা ফোন করে বলতেন, সুনীল, ডিনার খাওয়া হয়নি তো? ভারতীয়রা তো বেশ রাত করে ডিনার খায়। তুমি তৈরি হয়ে নাও, আমি এক্ষুণি এসে তোমাকে তুলে নিচ্ছি, একটা ইন্টারেস্টিং জায়গায় যাবো।

কোথায় যাবো, কী উপলক্ষ তা জানাতেন না।

আমি তখন হয়তো মার্গারিটের সঙ্গে বসে রেড ওয়াইন খেতে খেতে জাঁ জেনের উপন্যাস বিষয়ে আলোচনা করছি, মার্গারিট পুরো সন্কেটা আমার সঙ্গে কাটাবার জন্য এসেছে, যথাসময়ে মাশরুম-ওমলেট রান্না করবে, এর মধ্যে তাকে ফেলে যাবার কোনও মানে হয়? খুবই অন্যায়। কিন্তু আমি পলের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারতাম না। অন্যান্য আমন্ত্রিত লেখকদের তুলনায় কেন জানি না পল আমার সঙ্গে বিশেষ রকম ভালো ব্যবহার করেন। তাতে অন্য অনেক আমন্ত্রিত ছাত্রদের যে কিছুটা হিংসে হয়, তাও আমি বুঝি। কিন্তু কেউ যদি আমার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায়, তাতে আমি কী করতে পারি? আমি তো কখনও গুঁর তোষামোদ করি না! অ্যারিজোনা কিংবা ডেট্রয়েটের মতন দূর দূর জায়গাতেও শুধু আমাকেই সঙ্গে নিয়ে তিনি বারবার গেছেন, যাতে আমার নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয়।

একবার সিডার র‍্যাপিডসে এক শয্যাশায়িনী বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করার সময় পল আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সম্পূর্ণ অকারণে। পলের মা মারা যান পলের তিন-চার বছর বয়সে, মাতৃস্মৃতি কিছুই নেই। এই মহিলা ছিলেন তাঁর মায়ের বান্ধবী। পল তাঁর খাটের পাশে বসে জিগ্যেস করলেন, আন্টি, তুমি আমাকে আমার মায়ের কথা বলো। কেমন স্বভাব ছিল মায়ের, ছটফটে না শান্তি? রোদ্দুর ভালোবাসতেন, না বৃষ্টি? বেশি বেশি সাজগোজ করতেন? কবিতার বই পড়তেন?

অদ্ভুত সেই দৃশ্য। পঞ্চাশ বছরের এক প্রৌঢ়, বালকের মতন কৌতূহল নিয়ে মায়ের গল্প শুনছেন। মনে মনে নির্মাণ করে চলেছেন অদেখা মায়ের ছবি। সেদিন পল আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে খুব খুশিই হয়েছিলাম। সেইজন্যই পলের হঠাৎ হঠাৎ সাক্ষ্যকালীন আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি যে তখন সন্কেগুলো মার্গারিটের সঙ্গে কাটাই তা জানতেন না পল। এদেশের

ছেলেরা নিশ্চয়ই জানিয়ে দিতো, কিন্তু সঙ্কোচ বোধ করতাম আমি। তখন পর্যন্ত মার্গারিটের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল খুবই গোপন।

সেই সন্কেবেলাতেও মার্গারিটের সঙ্গে আমার নিভৃত আড্ডা বেশ জমে উঠেছিল, তার মধ্যে পলের ওই জরুরি আহ্বান। ওকে ছেড়ে যেতে আমার খুবই খারাপ লাগতো, মার্গারিটও ক্ষুব্ধ বোধ করতো, কিন্তু বাধা দিতো না।

সে বলেছিল, ঠিক আছে যাও, ভালো ভালো খাবার খেয়ে এসো, আমি কিন্তু ফিরে যাবো না, এখানেই তোমার বিছানায় শুয়ে থাকবো।

সেপ্টেম্বর মাস, শীত পড়েনি, গরম পোশাক লাগে না। শুধু শার্ট-প্যান্টেই চলে যায়। আমি প্যান্ট পরেই ছিলাম, একটা শার্ট গলিয়ে নেমে গেলাম নিচে। ঠিক সময়ে পল এসে আমাকে তুলে নিলেন গাড়িতে।

কোথায় যাচ্ছি, তা জিগেস করে লাভ নেই, পল সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বলবেন, চলোই না, গিয়ে দেখবে।

শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরে একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামলো।

পল বললেন, এটা আমার বন্ধু ভ্যান অ্যালেনের বাড়ি। তুমি তো তাঁকে মিট করেছো?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

ভ্যান অ্যালেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী, পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আমার সঙ্গে দু'একবার দেখা হয়েছে। মানুষটি খুব মৃদুভাষী ও ভদ্র। আমাদের দেশে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তদের সংখ্যা এতই কম যে কেউ একজন পেলেই খুব হইচই হয়। আর এখানে নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের সংখ্যা এতই বেশি যে কেউ আলাদাভাবে পাত্তা দেয় না। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় এমন কিছু নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সেখানেই নোবেল লরিয়েটের সংখ্যা আটচল্লিশজন। ক্যাম্পাসে হাঁটতে গেলে নোবেল লরিয়েটদের গায়ে ধাক্কা লেগে যায়। ভ্যান অ্যালেনও এখানে সাধারণ মানুষের মতন ঘুরে বেড়ান।

বাইরের পার্টিকোতে ভ্যান অ্যালেন বসে আছেন। আমি প্রথমে ভাবলাম, তা হলে এই বাড়িতে আজ ডিনার! কিন্তু আর কোনও অতিথি তো আসেননি।

ভ্যান অ্যালেন আমাদের সাক্ষ্য সম্ভাষণ করার পর বললেন, পল, আমি রেডি, চলো বেরুই।

তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, সুনীল, তুমি বসো...

তিনি উঠে গিয়ে পলকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে নিম্নস্বরে কিছু আলোচনা করতে লাগলেন। কেন যেন মনে হল, আলোচ্য বিষয় আমিই। আমি কি কোনো ভুল করে ফেলেছি?

একটু পরে পল আমার কাছে এসে বললেন, সুনীল, তুমি কিছু মনে করো না। এখানে একটা নতুন রেস্টোরাঁ খোলা হয়েছে, তার খাবারের খুব সুনাম, কিন্তু একটা অসুবিধে হচ্ছে সেখানে যাবার...

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমার গায়ের রঙের জন্য সেখানে আমাকে ঢুকতে দেবে না! তাতে কী হয়েছে? তোমরা যাও, আমি এখান থেকে হেঁটেই ফিরে যেতে পারবো।

পল এবার মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, গায়ের রং আমাদের আয়ওয়া স্টেটে ওরকম কোনও ব্যাপার নেই। গায়ের রং নিয়ে কেউ মাথাই ঘামায় না। মুশকিলটা অন্য, ওখানে ড্রেস কোড আছে। তুমি তো শুধু শার্ট পরে আছো, ওখানে ঢুকতে গেলে একটা জ্যাকেট পরতে হয়...

আমি বললাম, তা তো আমি জানতাম না। ঠিক আছে, তোমরা দুজনে যাও, আমি ফিরে যাচ্ছি, আমি কিছু মনে করবো না।

মনে মনে ভাবলাম, ভালোই হল, আগে আগে ফিরে গিয়ে মার্গারিটকে চমকে দেব!

পল বললেন, ফিরে যাবে কেন? তুমি শার্টটা গুঁজে নাও। তারপর ভ্যান অ্যালেনের অনেকগুলো জ্যাকেট আছে, কয়েকটা ট্রাই করে দেখো, তোমার গায়ে একটা না একটা ঠিক লেগে যাবে।

ভ্যান অ্যালেন দু'তিনটে জ্যাকেট নিয়ে এলেন। তাঁর শরীরের আকৃতি অনেকটা আমারই মতন। একটা জ্যাকেট আমার গায়ে বেশ ফিট করে গেল।

পল এস্গেল বললেন, এই তো ঠিক আছে। কিন্তু...

আবার কিন্তু?

আমি প্যান্টের ওপর শার্ট পরে ছিলাম। গুঁজে পরলে তো একটা বেল্ট লাগে, না হলে ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়। বেল্ট পরে আসিনি।

ভ্যান অ্যালেন কয়েকটা বেল্ট এনে বললেন, দ্যাখো তো, এর একটা তোমার লাগে কি না।

একটা বেল্টও বেশ ফিট করে গেল।

ভ্যান অ্যালেন বললেন, এই তো ঠিক আছে। টাই না হলেও চলবে!

আমি এবার রেডি। হঠাৎ পল এস্গেল খুব জোরে হাসতে শুরু করলেন আমার দিকে তাকিয়ে। কয়েক মুহূর্ত বাদে ভ্যান অ্যালেনও যোগ দিলেন সেই হাসিতে।

আমি ভ্যাবাচ্যাকা। এখন আবার কী হল? আমি সেই হাসির মর্ম বুঝতে পারলাম না।

পল হাসতে হাসতেই বললেন, সুনীল, তোমার কোমরে ভ্যান অ্যালেনের বেল্ট।

এবার আমার মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমক হল।

নোবেল পুরস্কার জয়ী পদার্থবিদ ভ্যান অ্যালেন আকাশে একটা নতুন নক্ষত্রপুঞ্জ কিংবা ওই ধরনের কিছু আবিষ্কার করেছেন। তার নামই দেওয়া হয়েছে ভ্যান অ্যালেনস বেল্ট। আমার কোমরে সত্যি সত্যি সেই ভ্যান অ্যালেনের বেল্ট!

সতেরো বছর পর পল এস্গেল আবার আমাকে সেই একইভাবে কোনো অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে যেতে চাইছেন। স্বাভাবিক যাবে না, সে নাটকের রিহার্সাল দিতে গেছে। আটটার আগে ফিরবে না। তার জন্য একটা নোট লিখে ফ্রিজের গায়ে স্টেটে দিলাম।

জানি না, আজ আমার জন্য আবার কী চমক অপেক্ষা করছে!

অধ্যাপক ল্যামবেয়ারের বাড়িতে পার্টি জমে উঠেছে। পল এঙ্গেল সেখানে আমাকে নিয়ে এলেন। আমি আমন্ত্রিত নই, কিন্তু এখানে এসব পার্টিতে অত ফর্মালিটির ব্যাপার নেই। গেট ক্র্যাশিং খুবই চলে।

প্রচুর নানাবয়েসি নারী-পুরুষ অন্তত চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন তো হবেই। বিভিন্ন ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে আড্ডা। পল আমাকে সঙ্গে নিয়ে এঘর-ওঘর খুঁজে অধ্যাপক ল্যামবেয়ারের সামনে এসে বললেন, ফিলিপ, এই সুনীলকে নিয়ে এসেছি, তোমার সঙ্গে ওর কী যেন একটা জরুরি কথা আছে। তুমি যদি ওকে একটু সময় দাও...

অধ্যাপক ল্যামবেয়ার আমাকে চিনতে পারলেন কিনা বোঝা গেল না। পলের বাড়ির পার্টিতে তিনি আমাকে অল্প সময়ের জন্য দেখেছিলেন। তবু ভদ্রতায় আন্তরিক হাসি দিয়ে বললেন, তুমি এসেছো, খুব খুশি হয়েছি। পার্টিতে যোগ দাও। আমি একটু পরে তোমাকে খুঁজে নেব।

পল এঙ্গেল চলে গেলেন। আমি খুঁজতে লাগলাম কোনও চেনা মুখ। এক একটা শব্দ একেকটা স্মৃতি উসকে দেয়। ফিলিপ এদেশ একটা কমন নাম। পল এঙ্গেল কিছুটা ফরাসি জানেন। ফরাসি ভাষায় এইচ অক্ষরটা আছে বটে, কিন্তু তার প্রায় কোনওই ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই হোটেল শব্দটি আছে বটে, ফরাসিরা লেখে হোটেল, উচ্চারণ করে ওতেল। হেনরি হয়ে যায় অঁরি। তা হলে এই অক্ষরটা রাখে কেন?

অঁরি মিশোর গদ্যকবিতাগুলি আমার খুব পছন্দ। আমি আগে তাঁর নাম বলতাম হেনরি মিশো। মার্গারিট আমাকে উচ্চারণ শুদ্ধ করার জন্য একদিন প্রায় কুড়িবার বলিয়েছিল, অঁরি, অঁরি, অঁরি। তবু মার্গারিট ঠিক যেভাবে উচ্চারণ করতো আমি ভারতীয় গলায় তা ঠিক রপ্ত করতে পারিনি।

একটা কাউন্টারের ওপর রয়েছে হরেক রকম মদের বোতল ও প্রচুর গেলাস। যার যেরকম ইচ্ছে নিজেই নিচ্ছে। পাশেই রয়েছে স্যাণ্ডুইচের এক ছোটখাটো পাহাড়, তা ছাড়াও ডিম সেক্স, জ্যাম ও পঁউরুটি। প্রথাসিদ্ধ কোনও ডিনার নয়। টেবিলে বসে খেতে হবে না। আড্ডাটাই আসল।

আমি একটা পানীয় নিয়ে চলে এলাম বাইরের ডেকে। একেবারে জঙ্গলের মধ্যে এই বাড়ি। এখনও অন্ধকারের দিকে তাকালেই মনে হয় গভীর অরণ্য। আগেরবার যখন এ বাড়িতে এসেছিলাম, তখন দিনেরবেলা, দুটো হরিণ দেখা গিয়েছিল। এ দেশে হরিণ প্রচুর। নিউ জার্সির দিকে রাস্তায় হরিণকে গাড়ি চাপা পড়তেও দেখেছি। কিন্তু মার্গারিট এখানকার সেই হরিণ দেখে বাচ্চা মেয়ের মতন হাততালি দিয়েছিল, মনে পড়লো সেই দৃশ্যটা।

ডেকের একপাশে পাঁচ-সাতজনের একটা জটলা। তাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন আমার নাম ধরে ডাকলো। সুনীল, সুনীল, এদিকে এসো।

কোনও পার্টিতে নিজে কারুককে খুঁজে পাওয়ার বদলে যদি হঠাৎ কেউ নাম ধরে ডাকে, তাতে একটা অন্যরকম থ্রিল হয়। বহিরাগত ভাবটা চলে যায়।

কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম অ্যানাকে।

একটা গাঢ় নীল রঙের গাউন পরা অ্যানা, হাতে একটা রেড ওয়াইনের গেলাস। তার পিঠ পর্যন্ত লম্বা চুল, সে কখনও চুলে খোঁপা বাঁধে না। সবসময় চুল খোলা রাখে।

অ্যানা বললো, এসো, আমাদের সঙ্গে জয়েন করো।

এভাবে ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামে নানান দেশ থেকে যে ক'জন লেখক-লেখিকা এসেছে, তাদের সকলের মধ্যে অ্যানাই যে সবচেয়ে সুন্দর, তা সবাই মেনে নিয়েছে। সে হাঙ্গেরিয়ান লেখিকা, ছোটগল্প লেখে। তার স্বামীও এসেছে, তার বয়েস আমার থেকেও যথেষ্ট বেশি। বেশ বুড়ো বুড়োই দেখায়। ষাট-বাষট্টি তো হবেই। তার স্বামী তাদের দেশে খুব খ্যাতিমান লেখক।

অ্যানা জিগ্যেস করলো, স্বাতী আসেনি?

আমি বললাম, না, সে একটা অন্য জায়গায় গেছে।

অ্যানা বললো, স্বাতী যে বলেছিল, আমাকে একদিন খাঁটি ইন্ডিয়ান রান্না খাওয়াবে? কই ডাকছে না তো!

আমি বললাম, যে কোনও দিন। কালকেই হতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে আরও তিন-চারজন বললো, এই আমরা বাদ যাবো নাকি? আমরাও ইন্ডিয়ান রান্না খেতে চাই।

অ্যানা জোর দিয়ে বলে উঠলো, না, না, তোমরা অন্যদিন যেতে পারো। কাল নয়। আমি এক্সক্লুসিভলি যেতে চাই। স্বাতী আর সুনীলের সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। আমি ইন্ডিয়ান রাজস্থানে যেতে চাই শিগগিরই!

আমার আর স্বাতীর সঙ্গে অ্যানার একটু বেশি ভাব।

গায়ের রঙে অ্যানা স্নিগ্ধ শ্বেতাঙ্গিনী অবশ্যই। কিন্তু তার চোখের মণি কালো আর মাথার চুল কালো। বেশিরভাগ হাঙ্গেরিয়ান মেয়েরই চোখের মণি নীল। সেই জন্য অ্যানার ধারণা, তার শরীরে জিপসি রক্ত আছে। সে কথা সে অনেককেই বলে বেড়ায়। আর বেশ ঝোঁক দিয়ে বলে, হ্যাঁ, সত্যি, সত্যিই আমি একটু একটু জিপসি। সুনীলদের দেশ ইন্ডিয়ান নাম শুনেলেই আমার কেমন যেন শিহরণ হয়। এখনও হচ্ছে, দেখো, দেখো, আমার হাতের রোম কেমন খাড়া হয়ে গেছে।

এই কথা শুনে, অনেকেই সেই সুযোগে তাকে একটু ছোঁয়ার জন্য তার হাতে হাত বুলোতে শুরু করে।

ওর স্বামীর নাম গিয়র্গি। ইংরিজি জর্জ। হাস্পেরিতে গিয়র্গি হয়ে যায়।

অ্যানা আমাদের ওর জীবনের আর একটা কথাও বলেছিল।

বাস্কা বয়েস থেকেই ওর লেখিকা হবার ইচ্ছে, তাই সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করেছে। বিয়ে করেছে ওর দ্বিগুণ বয়সি এক লেখককে। কিন্তু ওর লেখিকা হবার প্রধান বাধা ওর রূপ। পত্রিকার সম্পাদকরা ওর লেখার প্রশংসা করার বদলে ওর রূপের প্রশংসা করে। কেউ কেউ ওর সঙ্গে ডেটিং করতে চায়। আর দু'একজন বিখ্যাত লেখক, যারা ওর স্বামীকে হিংসে করে, তারা ওকে বলেছিল, তুমি লেখালেখির চেষ্টা ছেড়ে দাও। বরং ফিল্মে হিরোইন হবার চেষ্টা করো, তাতে সুবিধে হতে পারে।

আমি অ্যানাকে বলেছিলাম, আমাদের বাংলা ভাষায় চর্যাপদ নামে অনেক পুরোনো কবিতা আছে বৌদ্ধদের লেখা। তাতে একটা লাইন আছে এই রকম ‘আপনা মাসে হরিণা বৈরি।’ তার মানে হচ্ছে, হরিণের প্রধান শত্রু তার নিজের দেহের মাংস। এখনো অনেক নারী সম্পর্কেই কথাটা সত্যি, তাই না?

এখানে অ্যানার সঙ্গীরা আলোচনা করছে আমেরিকায় ডিভোর্স রেট নিয়ে। আর্জেন্টিনার লেখকটি বললো, এখানে আসার আগে ধারণা ছিল, আমেরিকায় ডিভোর্স রেট খুব বেশি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তা নয়।

সুইডেনের লেখকটি বললেন, হলিউডের সিনেমা দেখে ওরকম ধারণা হয়। আসলে আমেরিকা থেকে সোভিয়েত রাশিয়ায় ডিভোর্স রেট বেশি।

আর পোলান্ডের লেখিকা মারিয়া, যার বয়েস প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, একবারও বিয়ে করেনি, সে বললো, দেখো, এই আয়ওয়া

স্টেট, এটা মিড ওয়েস্ট, এখানকার সঙ্গে গোটা আমেরিকার তুলনা করো না। মিড ওয়েস্ট খুব কনজারভেটিভ। দেখো, এখানকার লোকেরা মদও বেশি খায় না। বেশ কিছু লোককে দেখবে, অ্যালকোহল স্পর্শই করে না।

এবারে আমি বললাম, পোলিশদের তুলনায় সব আমেরিকানরাই বোধ হয় কম মদ খায়, তাই না? ফরাসিরা কথায় কথায় বলে, পোলিশদের মতন মাতাল!

মারিয়া বেশ চটে গিয়ে বললো, ওটা ফরাসিদের বদমাইশি। আমরাও বলি, মাতাল দেখতে হয় তো ফরাসি দেশে যাও!

এ আলোচনায় আমি আর বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। কেউ একজন এসে বললো, আমাকে মসিয়ে লমবেয়ার ডাকছেন।

বেশ কয়েকজন মহিলা পরিবৃত হয়ে বসে আছেন সুদর্শন অধ্যাপক। বয়েস হয়েছে যথেষ্ট। তবু চেহারায় আকর্ষণ আছে। সতেরো বছর আগে ওঁকে যখন প্রথম দেখি, তখনো অনেক ছাত্রী ওঁর প্রেমে পড়ে যেত শুনেছি।

অধ্যাপক ল্যামবেয়ার আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে ডোরি নামে একটি মেয়ের ফোন নাম্বার চেয়েছিলে, কিন্তু মুশকিল হল, ফোনের খাতাটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। তাই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি।

আমি বললাম, আমি আসলে জানতে চেয়েছিলাম, একটি ফরাসি মেয়ে আপনার কাছে পি এইচ ডি করেছিল, তার নাম মার্গারিট ম্যাথিউ, সে এখন কোথায় আছে, তা আপনি জানেন কিনা। না হলে ডোরি...

অধ্যাপক বললেন, মার্গারিটের কোনো খবরই আমি জানি না। সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ডোরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। কিছুদিন আগে একটা দুর্ঘটনায় ওর পা ভেঙ্গে গেছে। ও এখন মেক্সিকো সিটিতেই আছে। তুমি অক্সফোর্ড পাজকে চেন?

আমি বললাম, তিনি বিখ্যাত কবি, নাম তো শুনেছিই, কিছু কবিতাও পড়েছি, কিন্তু আলাপ-পরিচয় তো নেই!

অধ্যাপক বললেন, অজ্ঞাভিও ইন্ডিয়ায় গিয়েছিল শুনলাম। যা হোক, সে ডোরির খবর জানবে নিশ্চয়ই। ডোরি কিছুদিন তার সেক্রেটারির কাজ করেছিল। ওকে ফোন করে জেনে নিতে পারো।

একটা ন্যাপকিনে তিনি ওঁর ফোন নাম্বারটা লিখে দিলেন।

কিন্তু তাতে আমার কোনো সুবিধা হল না।

একজন বিখ্যাত কবিকে কি এমনি এমনি ফোন করা যায়? তাও অন্য একজনের ঠিকানা জানবার জন্য? এটা মোটেই ভদ্রতা নয়। অজ্ঞাভিও পাজ শিগগিরই নোবেল প্রাইজ পাবেন বলে শোনা যাচ্ছে, নিশ্চয়ই ব্যস্ত মানুষ। তাঁকে এত সামান্য কারণে বিরক্ত করা চলে না।

ফোন নাম্বারটা আমার কাছে রয়ে গেল। ফোন আর করা হলো না।

আয়ওয়া তেমন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় না হলেও এখানে নানারকম অনুষ্ঠান হয়। একদিন এলা ফিটজেরাল্ডের গান শুনলাম। সে তো দারুণ অভিজ্ঞতা। ব্রডওয়ের খুব সার্থক নাটক ‘কোরাস লাইন’-এর অভিনয় হল পরপর দু’দিন। অ্যালেন গিনসবার্গের কবিতা পাঠের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এখনো দিন ঠিক হয়নি। শোনা গেল, বেশ কিছু বছর আগে ডিলান টমাসও এসেছিলেন এখানে কবিতা পাঠ করতে। সে এক মজার ঘটনা। ডিলান টমাসের কবিতার মতন তাঁর মাতলামির নানা গল্পও বিশ্ব-বিখ্যাত। ডিলান টমাস এখানে বদ্ধ মাতাল অবস্থায় ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তারপর আর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। সেই অবস্থাতেই তাঁকে আবার ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়।

খুব সম্ভবত শিকাগো শহরে (নিউইয়র্কও হতে পারে) ডিলান টমাস একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ডাক্তারের কঠোর নির্দেশ ছিল, মদ্যপান একেবারে বন্ধ। কিছুদিন কঠিন সংযম করে রইলেন। তার পর

হঠাৎ একদিন ভেঙে গেল সংযমের বাঁধ। সমস্ত শরীরে অসহ্য ছটফটানি। সেই অবস্থাতেই চুপিচুপি তিনি একটা বারে ঢুকে পড়েন এবং একসঙ্গে আঠারো পেন্স মদের অর্ডার দেন। সে আঠারো পেন্স তিনি সাজিয়ে ফেলেন পিরামিডের মতন। তাঁকে ঘিরে ভিড় জমে যায়। তারপর সেই হতচকিত মানুষগুলোর সামনে তিনি খুব দ্রুত একটার পর একটা গ্লাস শেষ করে বলেন, ইজ নট ইট ওয়ার্ল্ড রেকর্ড? সেই অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আগেরবার যখন আসি, তখন ব্রডওয়েতে ‘ডিলান’ নামে একটা নাটক চলছিল। বিখ্যাত মঞ্চ ও ফিল্মের অভিনেতা রিচার্ড বার্টন ছিলেন নাম-ভূমিকায়। তখন তাঁর স্ত্রী ছিলেন এলিজাবেথ টেলর। পল এঙ্গেল তখন কোনও কাজে নিউইয়র্ক এসেছিলেন। আমাকেও এনেছিলেন। আমরা উঠেছিলাম সেন্ট্রাল পার্কের পাশেই প্লাজা হোটেলে। সেই হোটেলেই ছিলেন এলিজাবেথ টেলর ও রিচার্ড বার্টন। বিশ্ববিখ্যাত দম্পতি। লিফটে ওঠার সময় দু’তিনবার ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। একথা শুনলে অনেকে হাসবে যে, অত কাছ থেকে এলিজাবেথ টেলরকে দেখে আমার মোটেই তেমন কিছু সুন্দরী মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছিল রং করা রবারের পুতুল। সেইসময়ই দেখেছিলাম, ওই হোটেলে চারজন অল্পবয়েসি ছেলেকে ঘিরে খুব হইচই হতো। হোটেল থেকে বেরোবার সময় শত শত ছেলেমেয়ের চোঁচামেচি। ভিড় ঠেলে তাদের দৌড়ে গিয়ে উঠতে হতো গাড়িতে। সেই উনিশশো চৌষটি সালে আমি তাদের নামও শুনিনি। সেই প্রথম শুনলাম ‘বিটলস’দের কথা। তাদের দেখেছি। কিন্তু গান শুনতে যাইনি।

স্বাভীদেব নাটকের রিহর্সাল দেখতে গেলাম এক দুপুরে। কোনও একজন জাপানি লেখকের নাটক। নানান দেশের নারী-পুরুষদের নিয়ে কাস্টিং। যারা সবাই মানব-সভ্যতার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। খুব একটা ঘটনার বাঁধুনি নেই। তবে সংলাপগুলি চিত্তাকর্ষক।

এরিক ওই নাটকের পরিচালক এবং প্রধান অভিনেতা। নাটকের ভাষা ইংরেজি। কিন্তু বিভিন্ন দেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উচ্চারণ আলাদা। স্বাতী একজন ভারতীয় নারী। সুতরাং তার সংলাপে আমেরিকান অ্যাকসেন্ট না থাকলেও চলে।

এরিক আমার সামনে এসে স্বাতীর অভিনয়ের দারুণ প্রশংসা করতে লাগলো। ও নাকি জাত অভিনেত্রী। দারুণ এক্সপ্রেশন ইত্যাদি। বউয়ের নামে প্রশংসা শুনলে কার না ভালো লাগে! যেন এটা আমারই কৃতিত্ব, আমি এমনভাবে হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু খানিক বাদে আমাকে বিপদে ফেলে দিল এরিক। সিগারেট টানার অবসরে আমাকে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বললো, সুনীল, তোমাকে আমি একটা কথা জিগ্যেস করতে চাই। ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। কীভাবে শুরু করবো বুঝতে পারছি না। কিন্তু ব্যাপারটা জেনে নেওয়া দরকার।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, কী ব্যাপার? বলেই ফেলো না!

এরিক বললো, নাটকের একটা দৃশ্যে ব্যাপারটা প্রায় ইনএভিটেবল, স্বাতীকে আমায় একবার চুম্বন করার কথা। এখন আমি জানি না, দৃশ্যটা রিয়েলিস্টিক্যালি করা সম্ভব কি না, অথবা বাদ দিতে হবে? মানে, তুমি অ্যালাউ করবে? শুধু স্টেজে একবার...

আমার একেবারে হতভম্ব হবার মতো অবস্থা। এরকম স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করতে আমি একেবারেই অভ্যস্ত নই। স্ত্রীকে কেউ চুম্বন করতে চাইলে স্বামীরা কী করে? রেগে যায়? কিংবা হে হে করে বোকার মতো হাসে? কিংবা বলবো, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, শুধু স্টেজে কেন, যতবার রিহর্সাল হবে, ততোবার ইচ্ছা মতন...

আমি বললাম, এরিক, নাটকের প্রয়োজনে যদি চুমু খেতে হয়, তাহলে, তুমি আমাকে জিগ্যেস করছো কেন? স্বাতীকে জিগ্যেস করো। ও যদি রাজি থাকে, তাহলে আমার কী বলার আছে?

এরিক বললো, হ্যাঁ, ওকে তো জিগেস করবোই। মানে, আমার ধারণা, আগে স্বামীর মতামত নিতে হয়। আমি বললাম, দেখো, আমি কোনও মতামত দিতে গেলেও মনে হবে, আমি স্বামীর অধিকার খাটাচ্ছি। ইট'স অ্যাবসোলিউটলি আপ টু হার...

রিহার্সাল আরও কিছুক্ষণ চলবে। আমি বেরিয়ে এলাম।

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বাতাসে কী একটা ফুলের গন্ধ। আমার মনটা হঠাৎ বেশ ফুরফুরে লাগছে। কেন? এইমাত্র আমি একজন উদার, প্রগতিশীল স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করে এলাম, সেইজন্য!

AMARBOI.COM

একসময় অ্যালেন গিনসবার্গের সঙ্গে আমার চিঠিপত্রে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তখনও কম্পিউটারের যুগ আসেনি। টেলিফোনও সুলভ নয়। খরচ তো বেশি বটেই, অনেক সময়ই ঠিক মতন কানেকশন হয় না। কল্পবিজ্ঞানের লেখক আর্থার সি ক্লার্ক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শতাব্দী শেষ হবার আগেই (বিংশ শতাব্দী) সারা পৃথিবীতেই যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হবে। তা যে সত্যিই হবে, আমরা কেউ গত ষাট-সত্তরের দশকেও বিশ্বাস করিনি। তা চিঠিই ছিল। প্রধান ভরসা।

কোনও কোনও লেখকের চিঠি লেখার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল। তাই পত্রসাহিত্যও ছিল সাহিত্যের একটি শাখা। রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য চিঠি লিখেছেন। শার্ল বোদল্যের নাকি তাঁর মাকে একই দিনে ছ'খানা চিঠি লিখেছিলেন। পল এঙ্গেল বছরে গড়ে চার হাজার চিঠি লিখতেন, তা প্রায় বিশ্ব রেকর্ড।

অ্যালেনও চিঠি লিখতো প্রচুর। অধিকাংশই টানা হাতের লেখা, শেষের দিকে টাইপ করতো। অ্যালেনের হাতের লেখা বেশ জড়ানো, দু'বার-তিনবার পড়ে পাঠোদ্ধার করতে হতো। একবার অ্যালেনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম, সে ইউরোপে আসছে একটা আন্দোলন দেশে দেশে ছড়িয়ে দিতে। আন্দোলনের ব্যাপারটা বেশ মজার। এই আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত নাম, 'লিমার'। পুরো কথায় 'লিগালাইজ মারিউয়ানা'। এই মারিউয়ানা বা ইন্ডিয়ান হেম্প, বাংলার বিগুন্ধ গাঁজা। পৃথিবীর বহু দেশেই এই গাঁজা নিষিদ্ধ মাদকের পর্যায়ে পড়ে। আমাদের

দেশেও একমাত্র ধর্মীয় কারণেই (শিবঠাকুরের পূজোতে গাঁজা লাগে, সাধু সন্ন্যাসীদের গাঁজা না হলে চলে না)। গাঁজা ব্যবহার করা যেত। এ ছাড়া প্রকাশ্যে গাঁজা টানা একটা অপরাধ।

অ্যালেন এবং বিট জেনারেশানের কবি-গদ্যকারদের মধ্যে গাঁজার নেশা খুব চালু হয়। পরবর্তীকালে হিপিরা এসে প্রবলভাবে গ্রহণ করে, আমেরিকায় অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের মধ্যে গাঁজা টানা ফ্যাশানের অন্তর্গত হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু নিষিদ্ধ বস্তু, চোরাপথে আসে। তাই দাম সাংঘাতিক। আমি যখন অ্যারিজোনার টুশন শহরে কিছুদিন ছিলাম, তখন দুই আমেরিকান যুবক-যুবতী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল শুধু গোপনে গাঁজা টানার জন্য। একজন ভারতীয়র পাশে বসে গাঁজা সেবন করার শখ ছিল ওদের।

অ্যালেন ও তার বন্ধুরা দাবি করেছিল যে গাঁজা খেলে শরীরের কোনও ক্ষতি হয় না, বরং ক্রিয়েটিভ কাজকর্মের জন্য গাঁজা খুব উপকারী। নানান ডাক্তারি রিপোর্ট ইত্যাদি তুলে তারা প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে অন্যান্য নেশা, যেমন অ্যালকোহল ইত্যাদির তুলনায় গাঁজা নির্দোষ, এমনকি সিগারেটের চেয়ে অনেক ভালো। কারণ সিগারেটে ক্যানসার হতে পারে এমন কথা তখনই শোনা যাচ্ছিলো, কিন্তু গাঁজার সে সম্ভাবনা নেই। টিমথি লিয়ারি নামে একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন গাঁজার সমর্থনে এক প্রবল প্রবক্তা। তাঁর মতে, বাড়িতে একজন অতিথি এলে, আপনি চা না কফি খাবেন, কিংবা বিয়ার না হুইস্কি, এইরকম প্রশ্নের বদলে, আপনি কি একটু গাঁজা খাবেন, এই প্রস্তাব অনেক স্বাস্থ্যসম্মত। সুতরাং গাঁজাকে আইনসঙ্গত করতে হবে, তা হলে তার দাম অনেক কমে যাবে, ঘরে ঘরে এর প্রচলন শুরু হবে।

এই দাবিতে হোয়াইট হাউসের সামনে সত্যাগ্রহ হয়ে গেছে, প্রেসিডেন্টের এক মুখপাত্রের সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে। গাঁজার স্বপক্ষে প্রচারও চলেছিল বিভিন্ন রাজ্যে। আইনসঙ্গত হবার আগে তো একটা

নিষিদ্ধ বস্তুকে নিয়ে প্রচার করা যায় না, তাই অবলম্বন করা হচ্ছিলো নানান কৌশল। তার একটা মজার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন শহরে পোস্টার পড়েছিল। ‘কিপ ক্যালিফোর্নিয়া গ্রিন— আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যেন এটা সবুজায়নের পক্ষে একটা সরল দাবি, যেন দেশে গাছ-পালা নষ্ট না করা হয়। কিন্তু ওদেশে সবুজায়ন বলতে প্রথমেই ঘাসের কথা মনে হয়, সারা আমেরিকাতেই সব রাস্তার দু’পাশে সুন্দর করে ছাঁটা ঘাস থাকে। ঘাস বা গ্রাস অবশ্যই গাঁজারই এক ডাকনাম। সুতরাং যে বুঝবার, সে ঠিক বুঝে নেবে।

অ্যালেন এই আন্দোলন ইউরোপে ছড়াতে এলে কোনও সুবিধে হয়নি। তুলনায় ইউরোপ অনেক কনজারভেটিভ। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোতে তো এসব আন্দোলনের প্রশ্নই ওঠে না। চেকোশ্লাভাকিয়া থেকে তাকে ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তরুণ সমাজকে ক্ষেপাবার চেষ্টা। কিছুদিন পর ইতালিতে তাকে এক কবিতাপাঠের আসর থেকে গ্রেপ্তারও করা হয়। পরনে সবুজ রঙের পাঞ্জাবি ও উত্তরীয়, ঘাড় ছাড়িয়ে যাওয়া চুল ও বুক পর্যন্ত দাড়ি, ঠিক যেন এক ভারতীয় সাধু ব্যক্তি। এখানে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় কবিতার মধ্যে অশ্লীলতার অভিযোগে।

কবিতা কখনও অশ্লীল হয় নাকি? যাই হোক, আদালতে দাঁড়িয়ে শান্ত গলায় অ্যালেন বলেছিল, আমি আমার কবিতায় অবচেতনের সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছি। এছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই।

আমরা অনেকে তখন অ্যালেনের মুক্তির আবেদন জানিয়ে ইতালিয়ান সরকারের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম।

এইসব প্রসঙ্গে মনে পড়লো, আমার বান্ধবী, মার্গারিট অ্যালেনকে কখনও পছন্দ করতে পারেনি। ব্যক্তি মানুষটিকে না, তার কবিতাও না।

এই সময়ের মাত্র বছর দেড়েক আগেই অ্যালেনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তারপর আমরা অনেক জায়গায় একসঙ্গে ঘুরেছি,

থেকেছি, রাতের পর রাত গান আর কবিতা নিয়ে কাটিয়েছি। অ্যালেন আমার কানে একটা নতুন মন্ত্র দিয়েছিল। কবিতা লেখার জন্য অনেক স্বার্থত্যাগ করতে হবে। ভালো রকম জীবিকা, সুখ-স্বচ্ছন্দ্য, প্রতিষ্ঠা পাবার চিন্তা থাকলে কবিতা লেখা যায় না। এরকম কথা আমাকে আগে কেউ কখনও বলেনি। আমি তখন অ্যালেনের খুবই গুণমুগ্ধ। আমেরিকাতে এসেই প্রথম যোগাযোগ করেছি তার সঙ্গে। সে আমাকে নিউইয়র্কে লোয়ার ইস্ট সাইডে তার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছে।

মার্গারিটের সঙ্গে গল্প করার সময় কথায় কথায় অ্যালেনের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তখনই মার্গারিট গম্ভীর হয়ে যায়। এ তো মহা মুশকিল। একজন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অন্যজন আমার একমাত্র বান্ধবী। একজনের সামনে অন্যজনের কথা বলা যাবে না? অ্যালেন অবশ্য তখনও পর্যন্ত মার্গারিটের অস্তিত্বের কথা জানতো না।

যেসব সন্ধ্যাবেলা আমার অন্য কোথাও যাবার থাকতো না, কেউ আসতো না আমার অ্যাপার্টমেন্টে, সেই সব সন্ধ্যাগুলোতে আমরা দুজনে নিরিবিলিতে পা ছড়িয়ে বসে, সামনে রেড ওয়াইনের বোতল নিয়ে (মার্গারিটের পাল্লায় পড়ে আমি তখন হুইস্কির বদলে ওয়াইনই বেশি পান করতে শুরু করেছিলাম) অনর্গল কবিতা পাঠ করতাম। মাঝখানে উঠে কিছু রান্নাবান্না বা খাওয়ার ব্যবস্থা, তারপর আবার কবিতা। এইভাবেই, ফরাসি কাব্যজগৎ সম্পর্কে আমার দীক্ষা হয়।

মার্গারিট মার্কিনি কবিতার মোটেই ধার ধারতো না। আমি ওকে দু'একবার বলেছি, তুমি এদেশে দু'তিন বছর আছে, কবিতা এতো ভালোবাসো, অথচ এখানকার কবিতা একেবারেই পড়বে না?

মার্গারিট ওর লিপস্টিক ছাড়া রক্তচন্দনবর্ণ ঠোঁট উলটে বলতো, আমেরিকান কবিতায় কী পড়ার আছে? শুধুই তো চৈচামেচি, কবিতা কোথায়? তুমি যদি ফরাসি কবিতার সঙ্গে তুলনা করো...

আমি হাসতে হাসতে বলতাম, সবসময় তুলনা করবো কেন? তুমি নিশ্চয়ই জানো, একজন আমেরিকান কবি একসময় তরুণ ফরাসি কবিদের খুব অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এডগার অ্যালেন পো'র প্রভাবেই ফরাসি দেশে নতুন কাব্য আন্দোলন শুরু হয়।

মার্গারিট অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, এডগার অ্যালেন পো আবার কবি নাকি? কবি হিসেবে কেউ তাঁকে এখন মনে রেখেছে? ভূতের গল্প আর রহস্য কাহিনির লেখক হিসেবেই তাঁকে সবাই জানে। ওসব বাজে কথা। কেউ রটিয়েছে।

আমি তাকে কখনও অ্যালেন গিনসবার্গের কবিতা পড়ে শোনাতে গেলে সে একটু বাদেই থামিয়ে দিয়ে বলেছে, এগুলি কি কবিতা? এতে কাব্যগুণ কোথায়? এ তো একেবারেই গদ্যের মতন।

আমি বলেছি, এটাই তো নতুন কাব্য-রীতি। পুরোনো লিরিক্যাল ফর্ম ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। ছন্দ-মিল-টিলের চিহ্ন নেই। একেবারে গদ্যের মতন হলেও গদ্য নয়। কবিতা ও গদ্য-ভাষার মধ্যে একটা সীমারেখা আছে। সেই সীমারেখাটা বজায় রাখা খুব শক্ত। অ্যালেন সেই দুরূহ কাজটিই করেছে। গদ্যের মতন লেখা হলেও তা গদ্য নয়। তোমাদের ভাষায় অঁরি মিশোও তো এরকম গদ্যে প্রায় গল্পের মতন কিছু কবিতা লিখেছেন।

মার্গারিট তবু বললো, যাই-ই বলো আর তাই-ই বলো, আমি এই ধরনের কবিতায় ঠিক কাব্যরস খুঁজে পাই না।

মার্গারিট কবিতার আধুনিক ধারাটা এখনও ঠিক উপলব্ধি করতে পারে না। ফরাসি কবিদের মধ্যে গিয়ম আপোলিনেয়ারেই সবচেয়ে বেশি ভক্ত মার্গারিট। আমাকে তাঁর কবিতা প্রায়ই শোনাতে। শুনতে শুনতে কিছু কিছু পঙক্তি মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল আমার। আপোলিনেয়ারের একটি চটি বই আছে, তার নাম বিসতেয়ার, তাতে আছে নানারকম পোকা-মাকড়, জন্তু জানোয়ার নিয়ে মজার মজার

প্রতীকী কবিতা। সে রকম ছোট ছোট কয়েকটি কবিতা আমি গড় গড় করে মুখস্থ বলতে পারতাম। তার মধ্যে একটি কবিতা এইরকম

পরিশ্রম করলে তবেই তো সাফল্য আসে গরিব কবির, কাজ করো, খাটো, খাটো! দেখছো না, সামান্য গুটি পোকারাই খেটে খেটে একদিন হয়ে যাবে চমৎকার প্রজাপতি!

এই আপোলিনেয়ারের সূত্রেই একদিন মার্গারিটের সঙ্গে অ্যালেন গিনসবার্গের যোগাযোগ হল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার ছোট রান্নাঘরটিতে আমি আর সে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ডিনার বানাচ্ছি। কী করে ডিম ফেটিয়ে, তার মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা অলিভ তেল দিয়ে মাইয়েনিজ বানাতে হয়, মার্গারিট আমাকে তা-ই শেখাচ্ছে আর গুনগুন করে কী একটা গান গাইছে। হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল।

আমি বললাম, মার্গারিট, তুমি অ্যালেন গিনসবার্গকে পছন্দ করো না। সে কিন্তু তোমার প্রিয়তম কবি আপোলিনেয়ারের খুব ভক্ত।

মার্গারিট অবাক হয়ে জিগ্যেস করলো, তাই নাকি? তুমি কী করে জানলে?

সে আমাকে মুখে তো অনেকবার বলেইছে, তা ছাড়া আপোলিনেয়ারের ওপর লেখা তার একটা কবিতাও আছে।

কী কবিতা? তোমার বন্ধু অ্যালেন কি ফরাসি ভাষা জানে?

খানিকটা জানে নিশ্চয়ই। ফরাসি সাহিত্য সম্পর্কে তার ভালোই জ্ঞান আছে। কবিতাটার নাম, ‘অ্যাট আপোলোনিয়ার’স গ্রেভ।’ অ্যালেন সেখানে গিয়েছিল, তাই নিয়ে লেখা।

মার্গারিট উত্তেজিতভাবে বললো, পের লাসেজ। প্যারিসের ওই কবরখানায় আপোলিনেয়ারের সমাধি আছে। তুমি আমাকে কবিতাটা শোনাতে পারো?

রান্নাঘর ছেড়ে আমরা চলে এলাম পাশের ঘরে। আমি তাকে শোনাতে লাগলাম কবিতাটা।

একটু পরেই দেখি, মার্গারিটের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

বহুকাল আগে মৃত এক কবির কথা মনে করে কোনও মেয়ে কাঁদতে পারে? সেই কবি ধন্য!

আমি তার কাঁধে হাত দিয়ে জিগ্যেস করলাম, কী হল?

মার্গারিট ধরা গলায় বললো, কবিতাটা খুব আন্তরিকভাবে লিখেছে। আহা, কী দুঃখের জীবন ছিল সেই কবির! মৃত্যুর সময় তাঁকে বিশেষ কেউ চিনতো না! যুদ্ধের সময়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, তাঁর মাথায় চোট লেগেছিল। সেই ব্যথাটা...

এরপর অনেকক্ষণ এই আলোচনাটাই চললো। রান্নাঘরে ডেকচিটে চাপানো আমাদের খিচুড়িতে ততোক্ষণে পোড়া দাগ লেগে গেছে।

সেই সন্ধ্যাতেই আরও একটা এমন ঘটনা ঘটলো, যাকে বলা যেতে পারে কাকতালীয়।

একসময় ফোন বেজে উঠলো। রিসিভার তুলেই পেলাম অ্যালেনের কণ্ঠস্বর।

মিড ওয়েস্টের অখ্যাত শহর আয়ওয়া সম্পর্কে অ্যালেনের ভালো ধারণা ছিল না। সে মনে করতো, সেখানকার মানুষজন খুব কনজারভেটিভ হয়। বিদেশিদের পছন্দ করে না। তাই আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার জন্য প্রায়ই আমাকে ফোন করতো। আমি আগে দু'একবার মার্গারিট সে সময় উপস্থিত থাকলে ওকে জিগ্যেস করেছি, তুমি অ্যালেনের সঙ্গে কথা বলবে?

ও প্রবল আপত্তিতে মাথা ঝাঁকাতো। একে তো অ্যালেনের কবিতা সম্পর্কে ওর কোনও আগ্রহ নেই। তাছাড়া তার ব্যক্তিচরিত্রও ছিল ওর ঘোর অপছন্দের। অ্যালেন ঘোষিত সমকামী। আর এই গৌড়া ক্যাথলিক পরিবারের মেয়েটির পক্ষে সে ব্যাপারটা ছিল খুবই অরুচিকর।

সেদিন কিন্তু আমার কথা বলার সময় মার্গারিট ইঙ্গিতে জানালো, ও অ্যালেনের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

আমি অ্যালেনকে বললাম, একটি ফরাসি মেয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, তোমার কি দু'মিনিট সময় হবে?

প্রায় পনেরো মিনিট কথা হল দু'জনের। কিছুটা ইংরেজি আর কিছুটা ফরাসিতে। ফোন রাখার পর মার্গারিট মুগ্ধভাবে বললো, মানুষটি কী ভালো! গলার আওয়াজে কোনও রকম আমেরিকান চালিয়াতি নেই। ঠিক যেন কোনও সাধুসন্তের মতন।

আমি বললাম, সাধুই তো। আধুনিক, সমকামী, অসংসারি, ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকা সাধু। আর ওর আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা একেবারেই খাঁটি।

এবারে এই দ্বিতীয়বার আয়ওয়া আসার আগে আমি ও স্বাতী প্যারিসে থেমে, কাটিয়ে এসেছি পনেরো দিন, আমার বন্ধু অসীম রায়ের আতিথেয়। আমার প্রথমবার প্যারিস দেখা মার্গারিটের সাহচর্যে। তখন অসীম কিংবা কোনও বাঙালির সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল না। মার্গারিট আমাকে সমস্ত দ্রষ্টব্যস্থানেই নিয়ে গিয়েছিল। আমরা স্যাভুইচ আর ওয়াইন কিনে নিয়ে এক একটা বাগানে বসে খেতাম। প্যারিসের সব কিছুই বারবার দেখা যায় আর স্বাতী এসেছে প্রথমবার। তার চোখ-মুখ মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন। স্বাতী কলকাতার আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে নিয়মিত ক্লাস করে ফরাসি ভাষা শিখেছে। ওর স্বপ্ন ছিল, পৃথিবীর আর কোনও দেশ হোক বা না হোক, প্যারিস একবার দেখতেই হবে। না হলে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেই স্বপ্ন এবার মধুর বাস্তব।

দিনকয়েক বিভিন্ন মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারিতে ঘোরার পর আমি অসীমকে বললাম, একবার পের লাসেজ কবরখানাটা দেখতে নিয়ে যাবে?

অসীম অবাক। কবরখানা আবার দ্রষ্টব্যস্থান হয় নাকি? আমাদের আর এক বান্ধবী প্রীতি সান্যালও আমাদের ভ্রমণসঙ্গী। প্রীতি কিংবা

অসীম, ওরা এত বছর এ শহরে থেকেও সে জায়গাটা কোথায় জানে না। ম্যাপ দেখে অবস্থান খুঁজে বার করা হল। আর সেখানে পৌঁছে বোঝা গেল, সেটা সত্যিই একটা বিশেষ দ্রষ্টব্যস্থান। এত বিশাল ও শিল্প-স্থাপত্য সমৃদ্ধ সমাধিভূমি পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা আমি জানি না। কয়েকশো বছর ধরে গণনাভীত মানুষের সমাধি, বিশেষ গণ্যমান্য, বিখ্যাত কিংবা খুব ধনী ব্যক্তিদের সমাধির পাশে রয়েছে নানা আকারের সব স্মৃতিস্তম্ভ, তার অনেকগুলিরই ভাস্কর্য সত্যিই দেখার মতন।

এতবড় সমাধিক্ষেত্রে বিশেষ কারুর কবরস্থান খুঁজে বার করা খুব শক্ত। সেই জন্যই টোকার মুখে একটা ম্যাপ দেওয়া হয়। অসীম রায় একজন ম্যাপ-বিশেষজ্ঞ, তবু সেই ম্যাপ দেখেও আমরা অনেকক্ষণ ঘুরেও কবি গিয়ম আপোলিনেয়ারের কবর বার করতে পারলাম না। কিন্তু অ্যালেন গিনসবার্গ তার কবিতায় লিখেছে, সেই কবরের সামনে সে বসে থেকেছে, তা তো মিথ্যে হতে পারে না। এবং ম্যাপেও আপোলিনেয়ারের নাম আছে। আলাদাভাবে নয়, অ্যালফাবেটিকাল অর্ডারে। আসলে বিখ্যাত সব রাজপুরুষ আর অভিজাতবর্গের অনেক বড় বড় জায়গা নিয়ে সমাধি, বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ। সে সবের মাঝখানে এক কবির সমাধি চোখে পড়বার মতন নয়।

অনেক ঘুরে ঘুরে আমরা সবাই যখন ক্লান্ত, তখন হঠাৎ চোখে পড়ে গেল। সত্যিই সেটি অনাড়ম্বর, ছোটখাটো ব্যাপার, সেরকম কোনও দর্শনীয় স্মৃতিস্তম্ভও নেই, আজও সেটা বেশ অনাদৃতই মনে হয়। কেউ সেখানে কখনও ফুল দিতে আসে বলে মনে হয় না।

সেটা দেখার পর অসীম আমাকে জিগেস করলো, আচ্ছা, সুনীল, এ দেশে তো আরও অনেক বড় বড় কবি আছে, হঠাৎ শুধু এই আপোলিনেয়ারের সমাধিটা দেখার জন্য তোমার এতো আগ্রহ ছিল কেন?

তখন আমি এই সমাধিটি কেন্দ্র করে অ্যালেন গিনসবার্গ ও মার্গারিটের যোগাযোগের উপরোক্ত কাহিনিটি জানালাম।

প্রীতি সান্যাল তখন স্বাতীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলো, আচ্ছা, স্বাতী, তোমার বর সুনীল যে এতো মার্গারিট মার্গারিট করে, ওর কথা অনেকবার লিখেওছে, এর জন্য তোমার রাগ কিংবা হিংসে হয় না?

স্বাতী সহাস্যে বললো, না, হয় না। আমি তো ওকে বলেই দিয়েছি, বিয়ের আগে যা হয়েছে, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এখন আর ওসব কিছু চলবে না। বিয়ের আগে আমিও যে দু'একটা প্রেম করিনি, তা তো নয়! তাছাড়া, মার্গারিটের কথা শুনতে আমার ভালোই লাগে। ওর সঙ্গে আমার আলাপ হলে নিশ্চয়ই ভাব জমে যেতো।

প্রীতি বললো, তা ঠিক। ওই মেয়েটার কথা পড়লে আমারও ওর সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে করে। সে এখন কোথায়?

আমি বললাম, জানি না!

স্বাতী বললো, মার্গারিট আমাকেও একসময় দু'একটা চিঠি লিখেছে। তারপর হঠাৎ আর যোগাযোগ নেই। তার কী হয়েছে কিছু জানা যায় না।

আমি অসীমকে বললাম, আমি আর একটা জায়গা দেখতে চাই। মমার্তে 'শা নোয়া' নামের একটা হোটেল বা নাইট ক্লাব আছে। সেখানে একবার নিয়ে যাবে?

অসীম জিগ্যেস করলো, সেটার কথা আবার কোন কবিতায় আছে?

আমি বললাম, কবিতায় নয়। একটা গানে। শুনেছি, এক সময় সে গানটা এ দেশে খুব প্রচলিত ছিল। এই গানটা মার্গারিট শিখিয়েছিল আমাকে। গানটা এই রকম

জ্য শার্শ ফরতুন তুতাতু দু শা নোওয়া ও ক্লেয়ার দ্য লা লুন আ মমার্ত ল্য শেয়ার আমি সব গানটা ওদের ফরাসিতে শোনাইনি। ওরা দু'জনেই ভালো ফরাসি জানে, আমার উচ্চারণে অনেক ভুলভাব ধরে ফেলবে। তা ছাড়া কয়েক বছরের ব্যবধানে আমি কিছু শব্দ ভুলেও

গেছি! গানটার মোটামুটি অর্থ হল, শা নোয়া অর্থাৎ ব্ল্যাক ক্যাট। কালো বেড়াল নামে একটা রেস্টোরাঁর চারপাশে খদ্দেরের আশায় আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। তখন মমার্তের সন্কেবেলা কী সুন্দর জ্যোৎস্না ফুটেছে।

এটা একটা রাস্তার বেশ্যার গান। সুরটা এমন করুণ ও মর্মস্পর্শী যে মনে গেঁথে যায়। গানের শেষ দিকটার কথাগুলোও দুঃখময়। অনেক ঘোরাঘুরি করেও বেচারি মেয়েটি সে রাত্রে একটা খদ্দের জোটাতে পারেনি। কিন্তু রোজগারের টাকায় কিছু খাবার-টাবার কিনে না নিয়ে গেলে বাড়ির লোক উপোস করে থাকবে। তাই সে একটা মুদির দোকানে গিয়ে কাতরভাবে বলছে, ওগো মুদি মশাই, আজ আমাকে কিছু ধার দিন। আমার কাছে টাকা নেই, আমি সোমবার শোধ করে দেবো!

ফরাসিতে টাকা হচ্ছে দারজঁ, আর, জ ন পা দারজঁ মানে আমার কাছে টাকা নেই। পুরো গানটার মধ্যে এই লাইনটি আমার সবচেয়ে প্রিয়। মার্গারিট আর আমি, আমাদের দু'জনেরই এক মাসের স্কলারশিপের টাকা একসঙ্গে একটা গামলার মধ্যে রেখে দিতাম। তারপর তার থেকে হচ্ছে মতন বেহিসেবি খরচ হতো। প্রায়ই দেখা যেত, মাসের শেষ দিকে সেই গামলার মধ্যে আর এক ডলারও নেই। তখন দু'জনেই সকৌতুকে গেয়ে উঠতাম, জ ন পা দারজঁ। জ ন পা দারজঁ...

সেই সন্ধ্যায় মমার্তে অনেক ঘোরাঘুরি করেও আমরা 'শা নোয়া' নামে কোনও রেস্টোরাঁ বা নাইট ক্লাব দেখতে পাইনি। হয়তো নামটা বদলে গেছে। এতোদিনে।

আয়ওয়ার ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামের সবচেয়ে ভালো দিকটা হচ্ছে, এখানে কোনও নিয়ম-কানূনের বন্ধন নেই। লেখকরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। কোনও ক্লাব কিংবা সেমিনারে যাবার বাধ্যবাধকতা নেই। কেউ ইচ্ছে হলে যাবে, না গেলেও কেউ প্রশ্ন করবে না। কেউ কেউ অনেক কিছু লেখে। আবার কেউ কিছুই লেখে না। এটা উনিশশো একাশি-বিরশি সালের কথা। পল এঙ্গেলের মৃত্যুর পর অনেক কিছু বদলে গেছে শুনেছি।

প্রথমবার তো আরও আগে, উনিশশো তেষটি সালে, তখন আরও একটা অতিরিক্ত সুযোগ পাওয়া যেতো। পল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিদেশি লেখকদের আমন্ত্রণ পাইয়ে দিতেন। তার ফলে লেখকেরা আমেরিকার অন্যান্য শহরে ঘোরাঘুরি আর অতিরিক্ত কিছুটা উপার্জনও করে নিতেন। আমি যেমন আরিজোনার টুসন বিশ্ববিদ্যালয়ে দিন সাতেকের আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানকার মরুভূমি ও বিখ্যাত ক্যাকটাস জঙ্গল দেখে এসেছিলাম।

তাছাড়া পল নিজেও আমাকে নিয়ে যেতেন নানান জায়গায়। তখন অবশ্য আমি একা ছিলাম। পল এঙ্গেলের উদ্যম ও জীবনীশক্তি ছিল অসাধারণ। অনায়াসে চার-পাঁচশো মাইল গাড়ি চালিয়ে চলে যেতেন কোথাও। মনে আছে, একবার মার্শাল টাউন নামে একটা ছোট শহরে আমাকে নিয়ে গিয়ে তিনি পৃথিবীর দীর্ঘতম চিংড়ি মাছ খাইয়েছিলেন। সত্যি সত্যি সেই লবঙ্গবৃক্কি ছিল প্রায় দেড় ফুট লম্বা। এবং এক

ফারমারের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন, যাঁর বাড়িতে একটি ঘরের দেওয়ালে ঝুলছে মাতিস, দেগা এবং রেনোয়ারঁর আঁকা তিনখানি আসল ছবি। সেসবগুলোর দাম যে কত কোটি টাকা, তার ঠিক নেই।

এবারে আমার সঙ্গে রয়েছে স্বাতী, পলও আর অতো ঘোরাঘুরি করেন না। তাঁর কাজের ভার অন্যদের দিয়েছেন। তাহলেও হঠাৎ একদিন আমাকে ডেকে একটা হলুদ রঙের চেক ধরিয়ে দিয়ে, আমার স্কলারশিপের অতিরিক্ত, বলেন, যাও না, স্বাতীকে নিয়ে কোথাও ঘুরে এসো। ও শুধু শুধু আয়ওয়ায় বসে থাকবে কেন?

এখানে আসবার পথে আমরা ক্যালিফোর্নিয়া ঘুরে এসেছি। সুতরাং পশ্চিম উপকূল সম্পর্কে স্বাতীর খানিকটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। এবারে একবার পূর্ব উপকূল, বিশেষত নিউইয়র্ক শহরটা দেখা দরকার। আরেকবার আমি অ্যালেন গিনসবার্গ। গ্রেগরি করশোদের সংসর্গে ভালোই সময় কাটিয়ে গেছি। আমার মতে, নিউইয়র্ক শহর, খুব সুন্দর কিংবা ঝকঝকে তকতকে না হলেও পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর শহর। সে শহর না দেখলে জীবনের অনেক কিছুই বাদ থেকে যায়।

যদিও আসার পথে আমরা বাস অ্যাকসিডেন্টেই প্রায় খতম হতে বসেছিলাম, তবু নিউইয়র্কে আমরা বাসেই যাবো ঠিক করলাম। আবার গ্রে হাউন্ড। যাবার পথে এবারেও একটা খুব অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটলো। এইসব দূরপাল্লার বাসে কোনও যাত্রীই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যায় না, কিন্তু একজন দীর্ঘকায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ এক সময় নিজের সিট ছেড়ে উঠে এসে ঠিক আমাদের পাশে দাঁড়ালো। যেন সে আমাদের কিছু বলতে চায়। আমি মুখ তুলে তাকালাম। সে কিছু বললো না দাঁড়িয়েই রইলো। এক হাতে সে রড ধরে আছে, অন্য হাতে একটা ছোট রেডিও সেটাতে বাজনা বাজছে। এই লোকটি আমাদের বাজনা শোনাতে এসেছে?

একটু পরে সে হঠাৎ রেডিওটা টপ করে স্বাতীর কোলের ওপর ফেলে দিলো। এ আবার কী ব্যাপার? ও কিছু একটা বললো, তা খুবই

দুর্বোধ্য। ও কী রেডিওটা আমাদের দিতে চায়? কিন্তু একজন অচেনা লোক কিছু দিতে চাইলেই বা তা নেবো কেন?

রেডিওটা তুলে তার হাতে দিয়ে বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ, উই ডোন্ট নিড ইট।

সে শব্দ করে হাসলো। ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো।

লোকটির চোখ দুটি ঘোলাটে লালচে। বোঝা যায়, সে খুব নেশা করে আছে। মদের নেশা নয়। মাতালদের আমি চিনি। এ নিশ্চয়ই কোনও একটা ড্রাগের নেশা করেছে। এই ধরনের নেশাগ্রস্তদের ধরন-ধারণ কেমন হয়, আমি ঠিক জানি না।

একটু পরে সে আবার রেডিওটা ফেলে দিলো স্বাতীর কোলে।

এবার আমি ঈষৎ ঝাঁঝালো গলায় বললাম, প্লিজ প্লিজ, আমি তো বলেছি, আমাদের রেডিওর কোনও দরকার নেই। ওটা তোমার কাছেই রাখো।

এবার সে নিজেই তুলে নিলো রেডিওটা কয়েক মিনিট পরেই ঠিক ওই ব্যাপার। যেন সে একটা খেলা পেয়ে গেছে। এ কী অদ্ভুত খেলা। নেশাগ্রস্তদের মতিগতির তো কোনও সহজ ব্যাখ্যাও নেই।

তবে একটা জিনিস লক্ষ করছি, রেডিওটা ও নিজেই তুলে নেবার সময় ইচ্ছে করে স্বাতীর উরু ছুঁয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ, শুধু খেলা নয়, এর মধ্যে বদমায়েশিও আছে। স্বাতী যেমন বিরক্ত, তেমন কিছুটা ভয়ও পেয়েছে।

এই অবস্থায় আমার কী করা উচিত?

স্বামী হিসাবে স্ত্রীর সম্মান-রক্ষা করার একটা দায়িত্ব তো আমার আছেই। লোকটাকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেব? লোকটির বিশাল বলশালী চেহারা। উলটে ও যদি আমাকে আক্রমণ করে? তাহলে আমি দাঁড়াতেই পারবো না, ছাতু হয়ে যাবো। তাছাড়া মারামারিতে আমি তেমন অভ্যস্তও নই।

তবু কিছু একটা তো করতেই হবে।

বাসে আমাদের কাছাকাছি কয়েকজন সাদা ও কালো যাত্রী ব্যাপারটা ঠিকই লক্ষ করেছে। কিন্তু কেউ একটাও মন্তব্য করেনি। এ দেশে কেউ অন্যদের ব্যাপারে মাথা গলায় না। এ হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতার চরম দিক।

লোকটি আমার এমনই গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে যে আমাকে উঠে দাঁড়াতে গেলেও তাকে টেনে সরিয়ে দিতে হবে। আমি উঠে দাঁড়ালাম, সে সরে গেল না। আমরা দু'জন একেবারে মুখোমুখি। সে কটমট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। যেন সিনেমার দৃশ্য। সাসপেন্স।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য বহারস্কে লঘুক্রিয়া হল। বাসটির গতি যে কমে এসেছে, তা আমরা খেয়াল করিনি। হঠাৎ জোরে হর্ন বেজে উঠতেই চমকে গেলাম। দু'জনেই। বাসটা একটা স্টেশনে থামছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটি উল্টোদিকে ঘুরে দরজার দিকে চলে গেল। নেমে পড়লো প্রথমেই।

এখানে কুড়ি মিনিটের বিরতি। অনেকে চা-কফি খায়। টয়লেটে যায়। এতক্ষণ আমার স্নায়ুগুলি কঠিন হয়েছিল, জড়তা কাটাবার জন্য আমি নেমে একটা সিগারেট ধরালাম। আবার যখন বাস চলবে, তখন ওই লোকটি আবার অসভ্য ব্যবহার শুরু করবে। এই প্রশ্নটা কাঁটার মতো খচখচ করছে মনের মধ্যে।

ড্রাইভারও নেমে দাঁড়িয়েছেন। গ্রে হাউন্ডের ড্রাইভারেরা বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও রাশভারি হয়। আমি তাঁর কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানালাম। সেই লোকটি তখনও কিছু দূরে দাঁড়িয়ে একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। সেদিকে দেখিয়ে দিতেই ড্রাইভার বললেন, হুঁ, ওকে জানি। ও এখানেই থাকবে, আর বাসে উঠবে না। বাকি পথ তোমাদের আর কোনও সমস্যা হবে না।

বাকি পথ আর কোনও সমস্যা হয়নি ঠিকই, কিন্তু ওই যে দেড় ঘণ্টা একটা লোক আমাদের দু'জনকে দারুণ টেনশনে রেখেছিল, তার ক্ষতিপূরণ হবে কী ভাবে?

এই ঘটনাটি কোনও ভারতীয় বন্ধুকে বলতে গেলেই তারা মন্তব্য করে যে, এখনকার কালো লোকেরা এইরকমই হয়।

জেনারалаইজেশন করা বেশিরভাগ মানুষের অভ্যেস। কালো মানুষদের মধ্যে যে কত গুণী-নামী শিল্পী রয়েছেন, তা তারা ভুলে যায়। একজন শ্বেতাঙ্গ নেশাখোরও তো এরকম অসভ্য ব্যবহার করতেই পারে। গায়ের রঙের ব্যাপারে অনেক ভারতীয়ই নিতান্ত ভণ্ড।

কটর শ্বেতাঙ্গদের কাছে আফ্রিকান আমেরিকানরা যেমন কালো, ভারতীয়রাও সেই রকম কালো। আমাদের দেশে আমরা যাদের ফরসা মনে করি, খাঁটি শ্বেতাঙ্গদের চোখে তারাও কালো কিন্তু ভারতীয়েরা কিছুতেই নিজেদের কালো বলে মানতে চায় না। তারা শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে বেশি ঘেঁষাঘেঁষি করে। সেই তুলনায় কালোদের সঙ্গে প্রায় কোনও সম্পর্কই রাখে না। ভারতীয় তরুণ বা তরুণীদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ তরুণ বা তরুণীদের বিয়ে-শাদি হয় প্রায়ই। কিন্তু আমি এ পর্যন্ত একজনও ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে কোনও কৃষ্ণাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গিনীর বিবাহ সম্পর্কের কথা শুনিনি। সে রকম কোথাও হয়ে থাকলেও তা খুবই দুর্লভ ঘটনা।

নিজের দেশেও ভারতীয়রা অনেকেই এখনও বর্ণবিদ্বেষী। কালো মেয়েদের সহজে বিয়ে হয় না। খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে প্রকৃত সুন্দরী ও ফরসা মেয়ে চাই, এই দাবি থাকে অজস্র। যেন সুন্দরী হতে হলে ফরসা হতেই হবে। পুরুষদের ক্ষেত্রে অবশ্য গায়ের রঙে কিছু আসে যায় না। তাদের ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে হয়।

পরে স্বাভাবিক আমাকে জিগ্যেস করেছিল, তোমার বান্ধবী মার্গারিটের সঙ্গেও এরকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল না?

সে ঘটনাটা আমারও মনে পড়ে গিয়েছিল। সেটা একটু অন্যরকম।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আমেরিকায় বর্ণবিদ্বেষের খুবই বাড়াবাড়ি চলছিল। ব্লু ক্লকস ক্ল্যানের নানান অত্যাচারের ঘটনা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যেতো। আমি থাকার সময়েই সিভিল রাইটস বিল পাশ হয় আবার সেই উপলক্ষে মারামারিও ঘটছিল নানান জায়গায়। বিশেষত

দক্ষিণের চারটি রাজ্যে। টিভিতে একদিনের একটা অনুষ্ঠান দেখে শিউরে উঠেছিলাম। একটা বন্ধ জলাভূমির সামনে রেলিং এ ভর দিয়ে দাঁড়ানো অ্যালাবামা রাজ্যের চারটে ছোকরা হাসতে হাসতে বলছে, আমরা মাঝে মাঝে একটা-দুটো নিগারকে মেরে ওই জলাটির মধ্যে ফেলে দিই। মাছেদের তো খাদ্য দরকার।

দক্ষিণের রাজ্যগুলি ভদ্রতার জন্য বিখ্যাত। আবার সেখানেই এরকম নিষ্ঠুরতা!

প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে। বহু কালো ছেলে-মেয়ে বর্ণবিদ্বেষের শিকার হতো বলেই বেশ কিছু প্রগতিশীল তরুণ-তরুণী নিজেরা অনেক ঝুঁকি নিয়েও কৃষ্ণাঙ্গদের সাহায্য করতো। সামাজিকভাবে তাদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতো। কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বিয়েও বেশ বেড়ে গিয়েছিল। বিশেষত নিউইয়র্ক অঞ্চলে। কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যেও এক শ্রেণির মধ্যে বাড়ছিল উগ্রতা। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র শান্তিবাদী হলেও উগ্রপন্থীদের নেতা ছিলেন ম্যালকম এক্স। শ্বেতাঙ্গদের সবাই ক্রিস্টিয়ান, তাই কালোদের অনেকে ইসলাম, ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। যেমন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বক্সার ক্যাসিয়াস ক্লে হয়ে যায় মহম্মদ আলি।

মার্গারিট আমেরিকার এই বর্ণবিদ্বেষ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি অপমান ও অত্যাচারে মর্মাহত বোধ করতো।

ফ্রান্সে বর্ণবিদ্বেষ নেই, কিন্তু জাতিবিদ্বেষ আছে, তাই আমেরিকার এই ব্যাপারটা দেখে তারা নাক সিঁটকোয়। মার্গারিট তাই কৃষ্ণাঙ্গদের বেশি বেশি খাতির করতো। ক্যামপাসের কিছু কিছু কালো ছেলে-মেয়েদের সঙ্গেই ছিল তার বেশি ভাব।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সে এক কাণ্ড করেছিল।

সেদিন সকাল থেকে খুব তুষারপাত হয়েছে। আমার ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায়, গাছগুলো সব রাতারাতি সাদা হয়ে গেছে। রাস্তার দু'পাশে অনেক অনেক বরফ।

আমি আর সারাদিন বাড়ি থেকে বেরুইনি। লেখাপড়া করছি একটু একটু। আবার মাঝে মাঝে রূপাস করে শুয়ে পড়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করছি। মার্গারিটের একটা ক্লাস আছে। ওকে পড়াতেও হয়, ও আসবে সাড়ে ছ'টার সময়। তারপর দু'জনে আজ আমরা হোয়াইট ওয়াইনের সঙ্গে ব্যাণ্ডের ঠ্যাং ভাজা খাবো ঠিক করে ফেলেছি। ফ্রগ। লেগস কিনেও রাখা আছে। দোতলায় থাকে আমার পোলিশ বন্ধু ক্রিস্তফ, প্রায়ই সে আড্ডা দিতে আমার ঘরে চলে আসে। আজ সে নেই, গেছে শিকাগোয়। পল এস্কেলও গেছেন অন্য কোথাও। সুতরাং আমরা দু'জনে নিরিবিলিতে বসে আড্ডা দেবো।

একসময় দরজায় নক। খুলে হতচকিত হয়ে গেছি। মার্গারিট এসেছে ঠিকই, তার পিছনে তিন দৈত্যাকার কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ।

মার্গারিট তাদের সাদর সম্ভাষণ করে ঘরের মধ্যে আসতে বললো। তারপর আমার দিকে ফিরে ব্যাখ্যা করে বললো, এরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, জানো। ওরা সিডার র‍্যাপিডস যাবে, কিছুতেই রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। কয়েকজনকে জিগ্যেস করেছিল, জানোই তো এখানকার অনেক লোক কালো মানুষদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করে! ভুল রাস্তা দেখিয়েছে। আজ এতো ঠাণ্ডা, ওরা সারাদিন কিছু খায়নি, তাই আমাকে বলছিল, ওদের গাড়িতে উঠে বড় রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে আসতে।

আমি মনে মনে আঁতকে উঠলাম। গাড়িতে উঠতে বলেছিল? সর্বনাশ!

মার্গারিট একটু দম নিয়ে বললো, আমার সঙ্গে তো এতো বই, তাই ওদের বললাম, এই কর্নারেই অ্যাপার্টমেন্টে বইগুলো রেখে আসি, তারপর নিশ্চয়ই পৌঁছে দেব। ওরা বললো, ওদের তাড়া আছে, বইগুলো নিয়েই আমাকে যেতে। তাই আমি বললাম, আমার সঙ্গে এসো, একটু কফি আর কুকি খেয়ে নেবে। এই ঠাণ্ডার মধ্যে ভালো লাগবে।

লোকগুলি নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিঃশ্বাসে প্রবল রামের গন্ধ। মুখ দেখলেই মনে হয়, এরা লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি। অন্তত

একজনের মুখ খুবই নিষ্ঠুরের মতন, ওভারকোটের দু'পকেটে তার হাত। রাস্তায় সবাই মিথ্যে পথ দেখিয়েছে? মার্গারিটকে গাড়িতে তুলতে চেয়েছিল, যে কোনও পেট্রোল পাম্পে (গ্যাস স্টেশন) গেলেই তো পথের নিশানা পাওয়া যায়।

মার্গারিট তোয়ালে এনে বললো, মাথা মুছে নাও। ইস, একদম ভিজে গেছে

তারপর এক বাস্‌ মিস্ট্রি বিস্কুট এনে বললো, এই নাও, এই কুকিগুলো আগে খাও, আমি এক্ষুনি কফি বানিয়ে আনছি।

সত্যি কথা বলতে কী, আমি বেশ ভয় পেয়েছিলাম। মাতাল অবস্থায় নারীদের ধ্বংস করার ঝোঁক চাপে অনেকের। এরা মার্গারিটের দিকে যেভাবে তাকাচ্ছে, তাতে সেটাই মনে হয়। মার্গারিটকে গাড়িতে তুলতে চেয়েছিল, এখনও যদি চায়, আমাকে খুন করা তো কিছুই নয়, তারপর মার্গারিটকে...

মার্গারিট ওদের এতো আন্তরিকভাবে যত্ন করতে লাগলো যে তার জন্যই খুব সম্ভবত ওদের অপরাধ প্রবৃত্তি জাখত হতে পারলো না। তার সারল্যের কাছে হিংসাও হার মেনে যায়।

মার্গারিট ওদের কাছে আমার পরিচয় দিতে গিয়ে উদ্বেগের সঙ্গে কত যে বিশেষণ জুড়ে দিল, তার ঠিক নেই। ওরা কী বুঝলো কে জানে!

মার্গারিট জিগ্যেস করলো, তোমরা কবিতা পড়ো? তোমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শোনেনি?

ওরা পরস্পরের মুখের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন মনে হল, এরকম প্রশ্ন ওরা জীবনে শোনেনি।

কফি-টিফি খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর সাহস-সঞ্চয় করে ওদের একজনকে বললাম, এই মেয়েটি তোমাদের গাড়িতে উঠে পথ দেখাতে গেলে ওকে তো আবার ফিরে আসতে হবে অনেকটা হেঁটে। আমার জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ওই যে একটা গ্যাস স্টেশন, ওখানে গেলেই ওরা ম্যাপ দিয়ে দেবে, সব বুঝিয়ে দেবে।

তারপরেই আমি টেলিফোনের কাছে গিয়ে কারুর সঙ্গে কথা বলার ভান করলাম।

লোক তিনটি অবশ্য এরপর প্রচুর থ্যাক্স ইউ, থ্যাক্স ইউ বলে চলে গেল।

আমি মার্গারিটকে বললাম, তুমি সত্যি সত্যি ওদের গাড়িতে উঠতে? আমি যদি বাড়িতে না থাকতাম? মার্গারিট অবাক ভাবে চেয়ে রইলো।

আমি বললাম, তুমি ওদের মতলব বুঝতে পারোনি? সিডার র‍্যাপিডস মোটেই দূর নয়। রাস্তা হারাবার কী আছে? দু'তিনবার দেখলে ওরা নিশ্চয়ই রোডসাইন দেখতে পাবে।

মার্গারিট বললো, ওরা কী আমাকে মিথ্যা কথা বলছিল?

এমন সুরে ও প্রশ্নটা করলো, যেন পৃথিবী থেকে সমস্ত মিথ্যা কথা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পরে এই কাহিনি শুনে আমাদের বন্ধু লিরয়, সেও একজন কৃষ্ণাঙ্গ এবং কবি, আমাকে বলেছিল, ওরে বাপরে, তোমরা খুব জোর বেঁচে গেছো। কালো লোক হলেই ভালো লোক হয় নাকি? আমাদের মধ্যে কত জাঙ্কি, গুন্ডা, খুনি, ডাকাত আছে। এই সমাজের ওপর যাদের রাগ বেশি, তারা স্বেচ্ছা মেয়ে পেলে ছাড়ে না। তাদের রেপ করে, খুন করে। ওই তিনটি লোক হয়তো এসব কিছু ছিল না। হয়তো নিরীহ সাধারণ মানুষই ছিল। মনে কোনও খারাপ চিন্তা এলেও শেষ পর্যন্ত তোমাদের কোনও ক্ষতি করেনি। কিন্তু মার্গারিটকে বলো, ও যেন কালোদের নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে না যায়! যে কোনও সময় বিপদে পড়তে পারে। বিশেষ করে বলবে, ও যেন কিছুতেই খুব চেনা মানুষ ছাড়া অন্য কারুর গাড়িতে না চাপে। যে যতই অনুরোধ করুক। কোনও মেয়েকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবার পর তার চিহ্নই কোথাও পাওয়া যায়নি, এরকম বেশ কিছু কেস হয়েছে।

মার্গারিটের কি শেষ পর্যন্ত এরকম কিছুই হয়েছিল?

আয়ওয়া নদীর দু'পাশে অনেক ফুল ফুটে থাকে। নানা রঙের ফুল, তার অনেকগুলিরই নাম আমি জানি না। স্বাতীর ফুল সম্পর্কে খুবই আগ্রহ। ও গভীর মনোযোগ দিয়ে প্রতিটি ফুল দেখে ও নাম জানতে চায়। সেদিন বিকেলে আমরা এরিকের সঙ্গে হাঁটছি, সে আবার খুব গাছপালা বিশারদ। স্বাতীর প্রশ্ন শুনে শুনে সে দিব্যি পটাপট নাম বলে দিচ্ছে। হঠাৎ একটা ফুলের নাম শুনে স্বাতী আর আমি চমকে উঠলাম একসঙ্গে। মার্গারিট!

মার্গারিট নামে যে একটা ফুল আছে, তা আমি জানতাম। কিন্তু ফুলটা কখনও দেখিনি আগে। এই ফুল নিয়ে একটা গল্পও প্রচলিত আছে। কোনও ছেলে যদি কোনও মেয়ের প্রেমে পড়ে আর মেয়েটির পক্ষ থেকে প্রেম কতখানি সে সম্পর্কে দ্বিধায় থাকে, তাহলে এই মার্গারিট ফুল নিয়ে এক একটি পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে নিজের মনে মনে জিগ্যেস করে, সে আমায় ভালোবাসে? সে আমায় ভালোবাসে না। এইভাবে শেষ পাপড়িটিতে যদি উত্তর থাকে, সে আমায় ভালোবাসে, তা হলেই খুশিতে তার মন ভরে যায়।

এখন অবশ্য এই ধরনের কুসংস্কারের খেলা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এখন তো এক সন্ধ্যার প্রেমই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিছানা পর্যন্ত গড়িয়ে যায়।

ফুলটা এক ধরনের ডেইজি, মাঝখানটা হলুদ, পাপড়িগুলো সাদা। এরিক বললো, দেখেছো, ফুলের আকারটা যেন একটা বড় চোখের মতন, এই জন্য এর আর এক নাম আছে, আই ডেইজি।

সে একটা ফুল ছিঁড়তে যেতেই স্বাতী হা হা করে বলে উঠলো, না, না ছিঁড়ো না, ছিঁড়ো না।

এরিক বেশ অবাক হয়ে তাকালো।

এরিকদের নাটক বেশ ভালোভাবেই উৎরে গেছে। এই প্রথম স্বাতী অভিনয় করলো একটা ইংরেজি নাটকে। সব মিলিয়ে বেশ প্রশংসাই হয়েছে নাট্য উপস্থাপনাটির।

এখনও এরিক প্রায়ই আড্ডা দিতে আসে আমাদের সঙ্গে। ও কী স্বাতীর প্রেমে পড়ে গেল নাকি? বেশ মুগ্ধভাবে চোরা দৃষ্টি দেয় তার দিকে। তাতে মনে মনে আমার হাসি পায়। উদার স্বামীর ভূমিকায় আমি ভালোই অভিনয় করতে পারি।

এরিকের গাড়ি একটা সেতুর ধারে পার্ক করা ছিল। একটু পরে সে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

স্বাতী এখানে এসে রান্নার বেশ উন্নতি করেছে। আগে সে ভাতের ফ্যান গালতেই জানতো না। এখন আর সে জন্য আমার সাহায্যের দরকার হয় না। তা ছাড়া, রাইস কুকারে রান্না করলে ফ্যান গালতেই হয় না। মাঝে মাঝে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে অন্যান্য দেশের কয়েকজন লেখক-লেখিকাদের নেমস্তনু করে খাওয়ানো হয়। স্বাতীর হাতের ডাল কিংবা ভেড়ার মাংসের ঝোল বেশ পছন্দ করে। কেউ কেউ একেবারে চেটেপুটে খায়। আমেরিকান ছেলেমেয়েরাও বাংলা রান্না মন দিয়ে খেয়ে ফেলে। আয়ওয়া শহরে কোনও বাঙালি খাবারের রেস্টোরাঁ নেই। জানি না, এখন বাংলাদেশিরা কেউ সেরকম রেস্টোরাঁ খুলছে কি না!

এদেশে প্রত্যেক দিন কেউ বাড়িতে রান্না করা খাবার খায় না। সেই একঘেয়েমি কাটাবার জন্য মাঝেমাঝেই বাইরের কোনও হোটেল-রেস্টোরাঁয় খাওয়ার রেওয়াজ আছে। আজ আমাদের বাইরে খাওয়ার দিন স্বাতীর পছন্দ থাইল্যান্ডের খাদ্য। এখানে এই একটা বিশেষ

সুযোগ, বেছে বেছে এক একদিন এক একটা দেশের খাদ্য পানীয় চেখে দেখা যায়।

আগেরবার মার্গারিট আর আমি যখন একসঙ্গে খেতাম, তখন প্রায় প্রতিমাসের শেষেই আমাদের দু'জনেরই টাকা পয়সা ফুরিয়ে যেতো। দোকানে খাওয়া তো দূরের কথা, বাড়ির জন্য বাজারেও অনটন। তখন আমার প্রতিবেশি পোলান্ডের লেখক ক্রিস্তফের কাছে ধার করতে হতো। আমার চেয়ে বয়েসে বেশ বড় ক্রিস্তফ বেশ হিসেবি এবং একটু কৃপণ স্বভাবের। তার ধার আমি পরের মাসেই ঠিক শোধ করে দিই, কিন্তু পরপর দু'মাস ধার চাইলে সে কিছু একটা তুচ্ছ অজুহাত দেখিয়ে কিছুতেই দ্বিতীয় মাসে দিতে চায় না, বরং উপদেশ দেয়। অগত্যা তখন ফেনাভাত-ডিমসেদ্ধই দিনের পর দিন।

এবারে আর সে সমস্যা নেই। সেবারে হাত খরচ পেতাম মাসে দুশো ডলার মাত্র, এবারে বারোশো। তাছাড়াও মাঝে মাঝেই কিছু অতিরিক্ত বরাদ্দ। তাতে হাতে ভালোই টাকা থাকে, খাওয়াপরা, শখের কেনাকাটা ও থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখা সবই কুলিয়ে যায়।

মৃদুমন্দ হালকা হিমেল বাতাস বইছে, হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছে। থাই রেস্টোরাঁয় পৌঁছে গেলাম অবিলম্বে। এদেশের রেস্টোরাঁয় সরাসরি ভেতরে ঢুকে ইচ্ছেমতন যে কোনও টেবিলে বসে পড়া যায় না। কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়, সে দোকানের একজন কেউ এসে কোনও টেবিলে নিয়ে যায়। আমাদের দেশে এই রীতিটি এখনও চালু হয়নি।

আজ থাই দোকানটিতে বেশ ভিড়। আর দু'তিনজনের সঙ্গে আমাদেরও একটি ছোট কাচের ঘরে অপেক্ষা করতে হবে। সেখানে বসামাত্র স্বাতী আমাকে জিগ্যেস করলো, এখনো মার্গারিটের কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না? ইস, তার সঙ্গে দেখা করতে এতো ইচ্ছে করছে!

আমি আস্তে আস্তে দু’দিকে মাথা নাড়লাম। নাঃ মার্গারিট সম্পর্কে কিছুই এখনও জানতে পারিনি।

এর মধ্যে একদিন ডোরি নিজেই আমাকে ফোন করেছিল। খুব সম্ভবত অধ্যাপক ল্যামবেয়ার তাকে আমার সন্ধান দিয়েছে।

ডোরি বললো, তুমি সুনীল? তোমার নামটা চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু তোমার মুখটা আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। প্রায় কুড়ি বছর আগে তোমায় দেখেছি।

আমি বললাম, কুড়ি না হলেও সতেরো বছর আগে। আমার মতন একজন সাধারণ মানুষকে মনে না থাকারই কথা। আমার কিন্তু তোমার কথা বেশ স্পষ্ট মনে আছে। তুমি আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলে। সেইজন্যই অধ্যাপকের কাছে তোমার খোঁজ করছিলাম।

ডোরি খানিকটা ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, মোটেই তুমি আমার জন্য আমার খোঁজ করেনি। তুমি আমার কাছে মার্গারিটের কথা জানতে চাও, তাই না?

এ কথাটা সত্যি হলেও তার ওপরে খানিকটা মিষ্টি প্রলেপ লাগিয়ে আমি বললাম, তুমি আর মার্গারিট দুজনেই তো একসঙ্গে এসেছিলে আমার অ্যাপার্টমেন্টে। তাই অনেকদিন পর আবার আয়ওয়া শহরে এসেছি তো, তাই তোমাদের দুজনেরই খবর জানতে ইচ্ছে করছে। আগে বলো, তুমি কেমন আছো?

ডোরি এবার তিক্ত গলায় বললো, না, আমার সম্পর্কে কিছু জানার দরকার নেই তোমার...

শুনেছি, তোমার একটা গুরুতর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল...

ফরগেট ইট! তুমি মার্গারিটের খবর জানতে চাও তো? আমি তার সম্পর্কে কিছুই জানি না। সে আমার এমন কিছু বন্ধু ছিল না।

আমি তো দেখেছি, তোমরা দু’জন প্রায়ই একসঙ্গে...

হ্যাঁ, কিছুদিন আমাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তারপর তুমিই তো তাকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলে। তুমি চলে যাবার পরেও আমার সঙ্গে তার আর প্রায় দেখাই হতো না। আমি আয়ওয়া ছেড়ে চলে আসার পর তাকে কখনও ফোনও করিনি, চিঠিও লিখিনি। ব্যাস! এবার ফোন রেখে দিই?

ডোরি, মনে হচ্ছে, তুমি আমার ওপরে বেশ বিরক্ত হয়ে আছো। তা হলে, তুমি আমাকে ফোন করলে কেন?

তোমার ওপর আমি বিরক্ত হবো কেন? প্রফেসর ল্যামবার্ট বললেন, তুমি মার্গারিটের কথা জানতে চাও। শোনো, আমি যতদূর জানি, মার্গারিট হঠাৎ একদিন আয়ওয়া ছেড়ে চলে যায়। কোথায় গেল, কেন গেল, তা আর কেউ শোনেনি। তুমি আমাকে আর কিছু জিগ্যেস করো না, প্লিজ, প্লিজ...

আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, ডোরি কাঁদছে।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, একি...

ডোরি ধরা গলায় বললো, আমি রেখে দিচ্ছি, আমায় ক্ষমা করো...

আমি ফোন ছেড়ে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। ডোরির মতন শক্ত ধাতুর মেয়েরা তো সহজে কাঁদে না। হঠাৎ সে কেন কেঁদে উঠলো? কেনই বা আমার ওপর তার রাগ রাগ ভাব?

রমণীর মনের এই দুর্জ্জ্বল রহস্য কি সারা জীবনেও আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে?

পল এস্কেলকেও এখানে আর একদিন জিগ্যেস করেছিলাম, তুমি বলেছিলে, মার্গারিটের সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে? তুমি কি আর একটু খুলে বলবে? তার ঠিক কী হয়েছিল? স্বাতী ওর সঙ্গে আলাপ করতে চায়। ও কী আর বেঁচে নেই?

পল খুব নিচু স্বরে বললেন, আমি সত্যিই আর কিছু জানি না। কয়েকটি কথা শুনেছি মাত্র। তা অতি ভয়ঙ্কর, কিন্তু তার কোনও প্রমাণ

নেই। সে কথা শুধু শুধু তোমাকে জানাতে যাবো কেন? অনেকদিন হয়ে গেল, এর মধ্যে তার আর কোনও সংবাদ শোনা যায়নি!

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসি ভাষা বিভাগেও সব অধ্যাপকেরা নতুন। তারা কেউ মার্গারিটকে চেনেই না। আর কেউ কিছুই জানাতে পারে না। মেয়েটি যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এক এক সময় আমার মনে পড়ে, সেই যে এক সন্ধ্যায় তিনজন ভীমাকার, নেশাগ্রস্ত কালো মানুষকে আমার ঘরে নিয়ে এসেছিল, তাদের মতিগতি আমার একটুও ভালো লাগেনি। সেইরকমই কি আর একবার সরলভাবে সে ওই ধরনের হিংস্র মানুষদের গাড়িতে উঠে বসেছিল? তারপর...

নাঃ, এটা মন থেকে মুছে ফেলাই ভালো।

বরং, ভাবতে ভালো লাগে, মার্গারিট এখন নদীর ধারে ফুল হয়ে ফুটে আছে।

যতবার ওই সেতুর পাশ দিয়ে যাই, সেই ফুলের দিকে তাকাই। কিন্তু কাছে গিয়ে হাত দিয়ে ছুঁই না!

